নাগরিক উদ্যোগ

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ১ম • জানুয়ারি - মার্চ, ২০২০

জোরপূর্বক গুম বিষয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতা ও জাতিসংঘের সুপারিশ

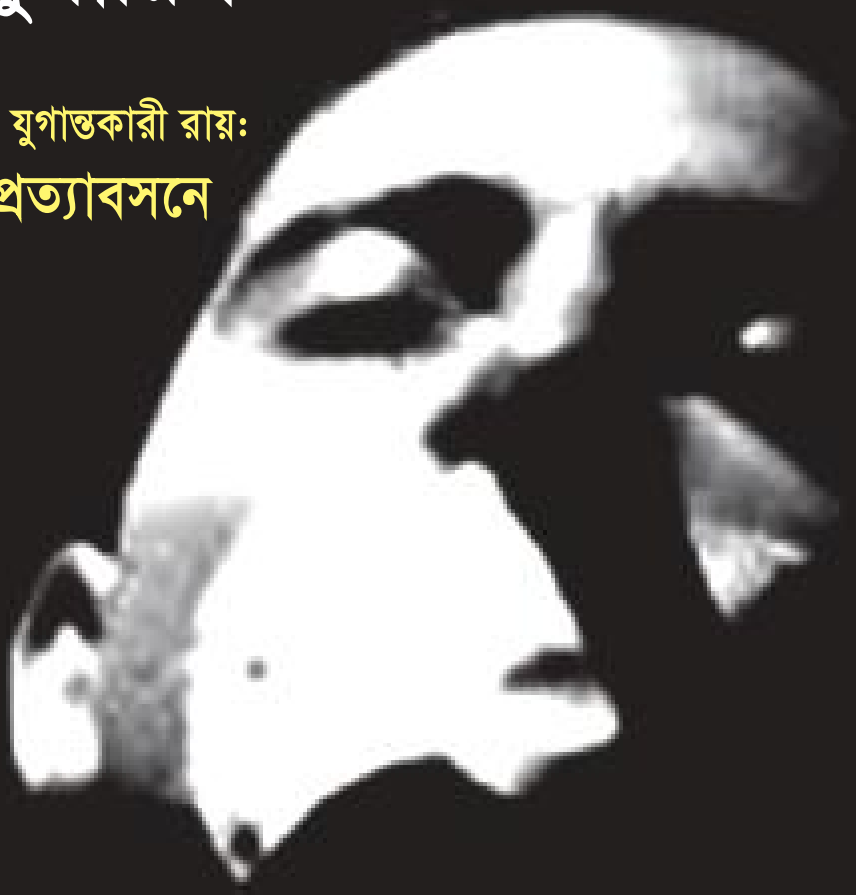

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের যুগান্তকারী রায়:

রোহিঙ্গাদের নিজভূমে প্রত্যাবসনে ঐতিহাসিক সুযোগ

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি: হাইকোর্টের নির্দেশনা

বৈষম্যের সঙ্গে লড়ছে ৭১% মানুষ

আইনের শাসন সূচকে বিশ্বের ১২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫ তম

সূচিপত্র

নাগরিক উদ্যোগ
সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ১ম, জানুয়ারি - মার্চ, ২০২০

সম্পাদক
জাকির হোসেন

সহযোগী সম্পাদক
মনজুরুল ইসলাম
মারুফিয়া নূর

সম্পাদনা পরিষদ
জাকির হোসেন
মনজুরুল ইসলাম
মারুফিয়া নূর
মো. আব্দুল্লাহ আল ইসতিয়াক মাহমুদ
নাদিরা পারভীন

৩
জোরপূর্বক গুম বিষয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতা ও জাতিসংঘের সুপারিশ

জোরপূর্বক গুমের বিরুদ্ধে আইনানুগ সুরক্ষা এবং গুমকে প্রতিহত করতে সর্বোচ্চ বিধিবিধান তৈরি করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ সব সদস্য রাষ্ট্রকে জোরপূর্বক গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ ২০০৬ অনুসমর্থন (Ratification) করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এ পর্যন্ত ৮১টি রাষ্ট্র কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং ৫৯টি সদস্য রাষ্ট্র ইতিমধ্যে অনুসমর্থন (Ratification) করেছে। এশিয়ার ৯টি সদস্য রাষ্ট্র কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এর মধ্যে মাত্র ৩টি রাষ্ট্র অনুসমর্থন করেছে। বাংলাদেশে এখনও এই কনভেনশনে স্বাক্ষর (Signature) বা অনুসমর্থন (Ratification) করেনি।

১৩
কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি: হাইকোর্টের নির্দেশনা

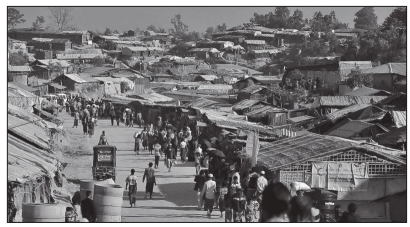

১১
আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের যুগান্তকারী রায়: রোহিঙ্গাদের নিজভূমে প্রত্যাবসনে ঐতিহাসিক সুযোগ

বিশ্বে আইনের শাসন ও মানবতার মর্যাদা রক্ষায় এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। আদালত বলেছেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত সহিংসতা ও বৈষম্যের নীতিতে গণহত্যার উদ্দেশ্য থেকে থাকতে পারে। আদালত এই বিবেচনা থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা ও বৈষম্য অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করি, একদিন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে রাখাইনে ফিরে যেতে পারবেন।'

২১
বিশ্বের দূষিত শহরের শীর্ষস্থানে ঢাকা

বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্ত ১৫
বৈশ্বিক লিঙ্গ অসমতা সূচকে পিছিয়ে বাংলাদেশ ১৮
বৈষম্যের সঙ্গে লড়ছে ৭১% মানুষ ১৯
স্বাস্থ্য ও পরিবেশ : নগরে গণশৌচাগার সংকট, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং কারণীয় ২০
আইন ও আদালত : আইনের শাসন সূচকে বিশ্বের ১২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫ তম ২৪
ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে শিশুদের বিচার ও দন্ড আইনসম্মত নয় ২৫
প্রাথমিক সমাপনী পরিক্ষায় শিশুদের বহিস্কার নয় ২৬
দলিত নারী ও টেকসই উন্নয়ন ২৭

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
বারেক হোসেন মিঠু

আলোকচিত্র
নাগরিক উদ্যোগ ও ইন্টারনেট

প্রকাশক
সম্পাদক কর্তৃক ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।

মুদ্রণ
প্রকাশক কর্তৃক নূর কার্ড বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী, ১৯/১, নীলক্ষেত
বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৪০ টাকা

যোগাযোগ
ফোন : ৯১৪৩৬৩৬, ফ্যাক্স : ৯১৪১৫১১
মোবাইল : ০১৭১৩ ০৮১৮৫২
ই-মেইল : nuddyog@gmail.com

সম্পাদকীয়

গুম এর ঘটনা নি:সন্দেহে চূড়ান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং একই সাথে সকলের জন্যই উদ্বেগজনক। গুম মানবতাবিরোধী অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে অব্যাহতভাবে গুমের ঘটনা ঘটেই চলছে। সাধারণত ভিন্ন মত পোষন কিংবা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই গুমের ঘটনাগুলো ঘটে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুম মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। গুম হওয়া থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ি, 'গুম করা' বলতে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌনসম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণকে বোঝাবে; যা কিনা সংঘটিত হয় স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাকে আইনী রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোর দ্বারা।

গুমের ঘটনা অবশ্যই আইনের শাসনের পরিপন্থি, কেউ যদি অপরাধ করে তবে দেশের আইন অনুযায়ি তার বিচার হবে। কিন্তু তা না হয়ে হঠাৎ করেই কেউ উধাও হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীতে কেউ আর এর দায় নিচ্ছে না। ভুক্তভোগীর পরিবারের জন্য থাকছে শুধু কান্না- আহাজারি, কোথায় কার কাছে এর বিচার পাবে জানে না স্বজনরা। একদিকে সরকার পক্ষ ক্রমাগত বলে যাচ্ছে যে, কোন গুমের ঘটনা ঘটছে না, অন্যদিকে নিঁখোজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন জানায়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই নিঁখোজ হওয়া ব্যক্তিদের কেউ কেউ ফিরে আসে, আবার অনেকে ফেরে লাশ হয়ে, অনেকে ফেরেইনা। যারা ফিরে আসে তারা মুখ খুলেনা কোথায় ছিল তারা।

গুম, অপহরণ, নিঁখোজ যাই হোক না কেন- এগুলো ন্যায়বিচার, আইনের শাসনের পরিপন্থী। এই ঘটনাগুলো জনসাধারনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, নিরাপত্তাহীনতা বোধ তৈরি করে। গুমের ঘটনা মানুষের মুক্তচিন্তার পথ রুদ্ধ করে, বাক স্বাধীনতা হরণ করে।

গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনা জঘন্য অপরাধ হিসেবে শিকার করে নিতে হবে। অতি দ্রুত এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। এইসব গুমের পিছনে যেই থাকুক না কেন, অপরাধীদের বিচার করতে হবে। কিন্তু এই অপরাধীদের বিচারে রাষ্ট্র মোটেই তৎপর নয়। বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুসমর্থন করতে হবে। ২০১১ সাল থেকে ৩০ আগস্ট প্রতি বছর আন্তর্জাতিক গুম দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সমাজ এবং গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবার গুমের বিচার এবং গুম বন্ধের দাবিতে সব সময়ই সোচ্চার এবং নানা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই ধরনের মানবাধিকারের লঙ্ঘন কখনই কোনো সমাজ, রাষ্ট্রকে পূর্ণ বিকশিত করতে পারে না, পারেনা পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। ব্যক্তি-দল-মত সকলকে একসাথে আওয়াজ তুলতে হবে দ্রুত গুম বন্ধে এবং ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া গুমের ঘটনার ন্যায়বিচার আদায়ে।

জোরপূর্বক গুম বিষয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতা ও জাতিসংঘের সুপারিশ

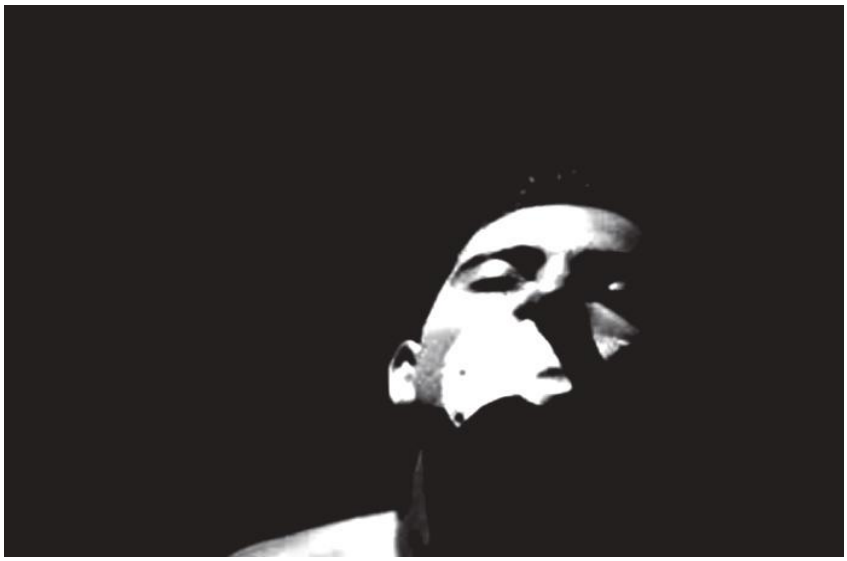

প্রসঙ্গকথা

বিগত পাঁচ দশক ধরে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার, সাম্য, স্বাধীনতা ও আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে, গণতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে এবং গণশক্তি উত্থান এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বর্তমান মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সুরক্ষার বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ চিন্তা বা গণতান্ত্রিক মীমাংসা জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে এই সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা সম্পর্কে আগাম তথ্য উপাত্ত বা প্রমাণ হাজির করা বা বলা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে এতটুকু লক্ষণীয় যে, একটি অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং অনেকটা অঘোষিত নিপীড়নমূলক অবস্থাসম্পন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের বেশ কিছুদিন যাবৎ দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

একদিকে, রাষ্ট্রীয় শোষণ ও নিপীড়ন জারি রেখে আমরা দেখতে পাচ্ছি জনগণের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে প্রাণ ও প্রতিবেশের নিরাপত্তা আজ ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন, অনেকক্ষেত্রে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য মানুষের জীবন-জীবিকা দিনকে দিন কঠিনতর হয়ে উঠেছে। একই সাথে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে যেতে হচ্ছে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয়-রাজনৈতিক কলহ এবং নতুন-পুরাতন ভৌগোলিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই জনগোষ্ঠির আবেগ, আকাঙ্খা, প্রতীক্ষা ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ এবং নাগরিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা আজকে বিশাল হুমকির সম্মুখীন।

এই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা, একে অপরের দোষারোপ ও অনিশ্চিয়তা- ভয় সংক্রান্ত তথ্য ও তৎপরতা যত দীর্ঘ হবে সংকট ততই ঘণীভূত হবে। তারই ধারাবাহিকতায় নাগরিকদের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংগঠন, সমাবেশ ও চলাফেরার অধিকার রক্ষা এবং আইন শৃংখলা রক্ষা বাহিনীর অঘোষিত দায়মুক্তিসহ সকল নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সম্মিলিত সাংবিধানিক মানবিক মৌলিক অধিকার রক্ষার বিকল্প নেই।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জোরপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণ ও জোরপূর্বক গুমের মত জঘন্য অপরাধে অপরাধীদের শাস্তি কিংবা ভূক্তভোগীদের ন্যায়বিচার চাওয়ার দাবীতে, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবার, আত্নীয় স্বজনেরা, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংগঠনসমূহ এবং কর্মীবৃন্দ সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি জোরপূর্বক গুম করাকে নিন্দা জানানোসহ, গুমের মত জঘন্য অপরাধসমূহকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পরিত্যাগ করার আহবান জানিয়ে আসছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহ।

বাংলাদেশে জোরপূর্বক গুমের বিরুদ্ধে একটি গঠনমূলক বিশ্লেষণ হাজির করার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধের মাধ্যমে, তবে বিশ্লেষণটিতে বিশেষ কয়েকটি ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যে সীমা টানা হয়েছে এবং পর্যালোচনায় জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামের আলোচনা- সুপারিশসমূহের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়েছে। নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক আইনি কাঠামোর উপর নির্ভর করে গঠনমূলক বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের শাসন, আইন এবং বিচারবিভাগসমূহের কর্মকান্ডের পর্যালোচনা বা সমালোচনা করবার সুযোগ রয়েছে এবং এই সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামের আলোচনা ও সুপারিশ বিষয়ে সমাজে আলোচনা করা জরুরি, যা আসলে বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক অধিকার এবং মতাদর্শিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

জোরপূর্বক গুমজনিত অপরাধ, আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার

প্রতিবছর ৩০ আগস্ট বিশ্বব্যাপী জোরপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক গুম দিবস পালিত হয়ে থাকে। এই দিবস আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো জোরপূর্বক গুম হওয়া বা কোন গোপন স্থানে আটককৃত ব্যক্তি যাদের কোন খোঁজ পরিবারের সদস্যরা জানেনা, তাঁদের বিষয়ে রাষ্ট্রকে দৃষ্টির আকর্ষণের একটি চেষ্টা কিংবা যারা গুম হয়ে গিয়েছেন তাঁদেরকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা। ১৯৮১ সালে কোস্টারিকার সংগঠন ল্যাটিন আমেরিকান ফেডারেশন অব এসোসিয়েশন ফর রিলেটিভস অব ডিটেইনড-ডিসএপিয়ার্ড এর উদ্যোগে এই দিবস পালনের প্রচলন প্রথম শুরু হয়, যা পরবর্তীতে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে।

জোরপূর্বক গুম থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও তা পালনের দায় থেকে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ১৯৯২ সালের ১৮ ডিসেম্বর জোরপূর্বক গুম থেকে সকল মানুষের সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি ঘোষণা গ্রহণ করা হয় (রেজুলেশন ৪৭/১৩৩)। এই ঘোষণার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর একটি আন্তর্জাতিক সনদ প্রণীত হয় এবং ২০০৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তা স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

জোরপূর্বক গুম রোধে আইনানুগ বিধিবিধানের প্রয়োজনীয়তা থেকে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ "জোরপূর্বক গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য ঘোষণাপত্র" (Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances) গ্রহণ করে। এই ঘোষণার সূত্র ধরেই পরবর্তীতে "জোরপূর্বক গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ ২০০৬" (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances 2006) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ২০১০ সাল থেকে কার্যকর হয়। ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বরে গৃহীত জোরপূর্বক গুম হওয়া সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদটি এমন একটি সনদ, যা অনুস্বাক্ষর করার পরবর্তীতে প্রতিটি রাষ্ট্রের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র; নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ; মানবাধিকার ও জনহিতকর সনদ;আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলগুলোকে বিবেচনায় রেখে এই সনদটি প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক সনদের ২ অনুচ্ছেদে, জোরপূর্বক গুম বা এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেন্সকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সনদ অনুযায়ি জোরপূর্বক গুম করা বলতে বুঝায় "রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌন সম্মতির মাধ্যমে কার্যত কর্মরত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা এক বা একাধিক ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংগঠিত হয়ে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণকে; যা কিনা সংগঠিত হয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার অথবা জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাকে আইনি রক্ষা কবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত করে'।

জোরপূর্বক গুমজনিত অপরাধ একজন ব্যক্তির জীবনধারণের স্বাধীনতা, চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা, ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সংগঠন, সমাবেশ ও চলাফেরার স্বাধীনতাকেও খর্ব করে। এ ছাড়াও ১ অনুচ্ছেদে অধিকতর ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, যুদ্ধাবস্থা হোক অথবা যুদ্ধভীতি হোক, কিংবা অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক অস্থিরতা হোক অথবা রাষ্ট্রের জরুরি অবস্থা কোন ধরনের পরিস্থিতি গুমের ন্যায্যতা তৈরি করে না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জোরপূর্বক গুমজনিত অপরাধকে চলমান পদ্ধতিগত অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারন আটক বা অপহরণের পর এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জোরপূর্বক গুম একটি

আদতে জোরপূর্বক গুম একটি জটিল অপরাধ এবং প্রতিটা জোরপূর্বক গুমের অপরাধই একই সাথে অনেকগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন। এর সাথে আরও এক বা একাধিক অপরাধ জড়িত থাকতে পারে, যেমন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, আটক, অপহরণ, নির্যাতন, ন্যায়বিচারে বাঁধা প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পরিবারের প্রতি নির্দয় ও নির্মম আচরন।

জটিল অপরাধ এবং প্রতিটা জোরপূর্বক গুমের অপরাধই একই সাথে অনেকগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন। এর সাথে আরও এক বা একাধিক অপরাধ জড়িত থাকতে পারে, যেমন, বিচার বহির্ভূত হত্যা, আটক, অপহরণ, নির্যাতন, ন্যায়বিচারে বাঁধা প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পরিবারের প্রতি নির্দয় ও নির্মম আচরণ। যার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তির স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও মর্যাদার অধিকার, নির্যাতনের শিকার না হওয়ার অধিকার এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার। জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তি হত্যা হয়ে থাকলে বা তার নিয়তি অজানা থেকে থ াকলে সেক্ষেত্রে জীবন ধারনের অধিকারও। একই সাথে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার বা স্বজনদের নিখোঁজ ব্যক্তির হদিস জানার অধিকার এবং মরদেহ ফিরে পাবার বা ক্ষতিপূরণ পাওয়াসহ অন্যান্য কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার অধিকার। জোরপূর্বক গুমের সাথে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাও জড়িত, যা ওই পরিবারের নারী শিশুসহ অন্যান্য স্বজনদের বহন করতে হয়ে। এক্ষেত্রেও এটা পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের লড়াই হয়ে দাঁড়ায়, যার ধারাবাহিকতায় তাদেরকে প্রায়শই ভয়ভীতি, নির্যাতন ও জিঘাংসার শিকার হতে হয়। যখন নারীরা জোরপূর্বক গুমের শিকার হয় তখন তারা যৌন নির্যাতনসহ অন্যান্য আরও অনেক ধরনের রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হতে পারেন। জোরপূর্বক গুম হওয়া পিতামাতা হারানো শিশুরাও

প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে গুমের ভয়াবহতার শিকার হতে পারে।

বাংলাদেশ জোরপূর্বক গুম: প্রেক্ষিত ও বাস্তবতা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর তথ্য মতে, ২০১৭-১৮ সময়ে কমপক্ষে ৮০ জন ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন, অন্যদিকে বাংলাদেশের অধিকার সংগঠনগুলোর বরাত দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস জানাচ্ছে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫০৭ জন গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ হয়েছে। এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন বলছে, জুলাই ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৫৩২ জন জোরপূর্বক গুমের শিকার হয়েছেন। উপরোক্ত, জোরপূর্বক গুমের শিকার ৫৩২ জনের মধ্যে মাত্র ৫২ জন ব্যক্তির পরিবার থানায় ডায়েরি করতে পেরেছেন এবং অনেক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে গিয়ে বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন। জোরপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তিবর্গ মূলত বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ভিন্ন মতালম্বী এবং উগ্র মতবাদের অধিকারী।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ২০১৯ সালে শুধুমাত্র জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসের মধ্যেই ১৯ জন ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা জোরপূর্বক গুমের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের মাঝে ১২ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, ৬২ জন ব্যক্তি ফিরে এসেছেন, ৪৭ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে এবং ২৩ জন ব্যক্তির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার' এ তিনটিই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত রাষ্ট্রের আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় দর্শন। জোরপূর্বক গুম থেকে সুরক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানে সুনির্দিষ্ট কিছু মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী বিচার লাভের অধিকার (৩১

নম্বর অনুচ্ছেদ) জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার (৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ) রয়েছে। এছাড়াও গ্রেফতারের কারণ দর্শানোর বিধান, আইনী সাহায্য লাভের অধিকার, আদালতের অনুমতি ব্যতীত কাউকে পুলিশ হেফাজতে না রাখার নির্দেশসহ গ্রেফতার ও আটক থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রক্ষাকবচ (৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদ) এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার (৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদ) এর মধ্যে অন্যতম। পূর্বোক্ত আইনগত সুরক্ষা থাকা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশে জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা বেড়ে চলছে। কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধানমূলক তৎপরতার অনুপস্থিতিতে, জোরপূর্বক গুমের শিকার স্বজনেরা, (আইনজীবী এবং মানবাধিকার সংগঠনের সহায়তা) হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন দায়ের করেছেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেছিলেন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবেদন দাখিলের বিষয় কোন প্রকার আলোর মুখ দেখেনি। যেমন, ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিন পরে রাজনৈতিক নেতা ইলিয়াস আলীর পরিবারের আবেদনের জবাবে হাইকোর্ট বিভাগ সমস্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তাদের তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে সাপ্তাহিক প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। যদিও প্রাথমিকভাবে সংস্থাগুলি আদালতের আদেশ মেনে চলছিল, তবে প্রতিবেদনে কোনও উল্লেখযোগ্য তথ্য নেই এবং পরবর্তীতে বলেছিল যে, তদন্ত চলমান ছিল এবং কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায়নি। ছয়মাস পর, প্রতিবেদনগুলি থেমে যায় এবং মামলাটি বাদ দেওয়া হয়।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির তদন্তমূলক পদক্ষেপের অভাব সত্ত্বেও নিখোঁজদের জন্য জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন কখনও ন্যায়বিচার পাওয়ার চেস্টায় সরাসরি আদালতে আবেদন করেন। নাগরিক সমাজ সংস্থা এবং মানবাধিকার সচেতন আইনজীবীদের সহায়তায় কমপক্ষে আটটি মামলায় জোরপূর্বক গুম হওয়া পরিবার হাইকোর্ট বিভাগে রিট আবেদন করেছিল। যেমন ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে নিখোঁজ হওয়া সাজেদুল ইসলাম সুমনের পরিবার ২০১৫ সালে হাইকোর্ট বিভাগে একটি পিটিশন দায়ের করলেও মামলাটি এখনও বিচারাধীন রয়েছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ফলে হাইকোর্ট বিভাগের এই রায় কার্যকর হয়েছিল যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি হাইকোর্টের তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কিত নিয়মিত প্রতিবেদন জমা দিতে বাধ্য ছিল। তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি কোনও নতুন তথ্য ছাড়াই বেশ কয়েক মাস রিপোর্ট জমা দেয়ার পর মামলাগুলো সাধারণত বাদ দেওয়া হয়েছিল বা অন্তত হাইকোর্টের বাইরে তা অনুসরণ করা হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, ২০১৪ এর এপ্রিলে সাত ব্যক্তি গুম ও পরবর্তীতে হত্যার ঘটনায় বাংলাদেশের হাইকোর্ট নারায়নগঞ্জের আলোচিত সাত খুন মামলার রায়ে কাউন্সিল নূর হোসেন এবং সাবেক র‍্যাব অধিনায়ক তারেক সাঈদসহ ১৫ জনের মৃত্যুদন্ডের আদেশ বহাল রেখেছে। এর আগে এই সাত খুন মামলায় ২৬ জনের মৃত্যুদন্ডের

> যথাযথ তদন্ত ও সঠিক বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত তত্ত্বগত ও তথ্যগত স্বল্পতার অভাবের পাশাপাশি গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনদের কণ্ঠরোধ ও জোরপূর্বক গুম বিষয় বিভিন্ন তথ্য গোপন করার প্রবনতার সুনির্দিষ্ট ধরণ এবং নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পর্কে নথিপত্রের অভাব জোরপূর্বক গুম করাকে অপরাধ হিসাবে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

রায় দিয়েছিল নারায়গঞ্জের ফৌজদারী আদালত। এদর মধ্যে ১৫ জনের মৃত্যুদন্ড বহাল রেখে বাকি ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে হাইকোর্ট। এ ছাড়া ৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডের রায় হাইকোর্টেও বহাল রয়েছে। বর্তমানে, মামলাটি আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে এবং সাত খুনের মামলায় হাইকোর্টের রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন নিহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা এবং রায় দ্রুত কার্যকর করার দাবিও তারা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, ২০১২ সালের ফ্রেবুয়ারিতে জোরপূর্বক গুম হওয়া আল মোককাদের পরিবার হাইকোর্ট বিভাগে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি রিট আবেদন করেছিল, যার ফলশ্রুতিতে হাইকোর্টের রায় ছিল যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নয় জন ব্যক্তি তিন সপ্তাহের মধ্যে আদালতে একটি ব্যাখ্যা দিবে। তবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আবেদন স্থগিত করেছিল।

জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের কিছু আত্মীয় সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে যান কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে, মিথ্যা অভিযোগের কারণে তাদের আত্মীয় স্বজনদের গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাদের আদালতে তোলা হবে। মানবাধিকার সংগঠন এবং কর্মীদের সাথে কথা বলে জোরপূর্বক গুম হওয়া ব্যক্তিদের বেশির ভাগ আত্মীয় স্বজনরা দেশীয় বিচার ব্যবস্থায় গভীর অবিশ্বাস প্রকাশ করেন। এবং ফলস্বরুপ অনেকে বলেন, যে তারা আদালতে মামলা করার চেস্টাও করেনি। অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্যের অভাব এবং বিজ্ঞ ও নিবেদিত আইনজীবীর অভাবে বিচার বিভাগের উপরে এই অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, কারণ নাগরিক সমাজ সংস্থা এবং মানবাধিকারভিত্তিক আইনজীবীর প্রত্যেক একক মামলা চালনা করতে বা এমন প্রতিটি পরিবারকে সাহায্য করা কষ্টকর।

স্বীকৃতি আদায়সহ আদর্শিক ও ধারণাগত এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য অবস্থান থাকা সত্ত্বেও জোরপূর্ববক গুম করাকে সমূলে প্রতিরোধ করার লড়াই এখনও বাংলাদেশে চলছে। গুমের চর্চা অব্যাহত গণতন্ত্রের জন্য একটা হুমকি। একদা সামরিক জান্তা ও অগণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক জোরপূর্বক গুম করার চর্চা এখনও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আকারে ভিন্নমত পোষণকারী ও রাজনৈতিক বিরোধীদের নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে। এছাড়া মানবাধিকার কর্মী, ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের ব্যক্তিবর্গ, স্বজনেরা, প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী, আইনজীবীসহ অনেকেই নির্যাতিন ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বস্তুত, শুধুমাত্র প্রিয়জনদের হারানোর বেদনাতেই বাঁধা শেষ হয়ে যায় না বরং বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রেও স্বজনদের নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মূখীন হতে হচ্ছে। কোন ধরনের প্রমান বা কৈফিয়তের সুযোগ না রেখে সাধারণত প্রতিপক্ষকে অযথা অবাঞ্চিত বা রাষ্ট্রের বা স্বজনদের মধ্যেই ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতাবোধ তৈরি করে না, তাদের সম্প্রদায়, সমাজ এমনকি পুরো জাতির মধ্যেই ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা বোধ তৈরি করে। উপরন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্যাতন ও হয়রানী এমনকি জোরপূর্ববক গুম হওয়ার বাস্তবতা রয়েই যাচ্ছে।

বর্তমানে চলমান বিচার ও তদন্তাধীন ঘটনাগুলোর উপর মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে এর উদহারণ পাওয়া যায়। যথাযথ তদন্ত ও সঠিক বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত তত্ত্বগত ও তথ্যগত স্বল্পতার অভাবের পাশাপাশি গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনদের কণ্ঠরোধ ও জোরপূর্বক গুম বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য গোপন করার প্রবণতার সুনির্দিষ্ট ধরণ এবং নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পর্কে নথিপত্রের অভাব জোরপূর্বক গুম করাকে অপরাধ হিসাবে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। প্রতিকারের বিধি-বিধান এবং বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা ও রাষ্ট্রে পক্ষ থেকে সহায়তা নিশ্চিত না করার ফলে গুমের ঘটনাবলির একটা নির্দিষ্ট ধরণ ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এতে নাগরিকদের নিকট মনে হতে পারে রাষ্ট্র পরিকল্পনা করে গুমের ঘটনা ঘটাচ্ছে বা রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্মতি দিচ্ছে।

বাংলাদেশের জোরপূর্বক গুম বিষয়ে জাতিসংঘের সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর)

জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে প্রতি সাড়ে চার বছর পর পর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে, যা সর্বজনীন পর্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনা বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ নামে পরিচিত। এ পর্যালোচনায় সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনের পাশাপাশি প্রতিবেদন প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত তিনবার সর্বজনীন পর্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনা বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ-এ অংশগ্রহণ করেছে যথাক্রমে ২০০৯, ২০১৩, ২০১৮ সালে। এখানে মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ হলো ২০০৯ সালে জোর পূর্বক গুমবিষয়ক কোন প্রকার আলোচনা সরকারের পাশাপাশি জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন করেনি। তবে ২০১৩ সালে দ্বিতীয় সর্বজনীন পর্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশে সংগঠিত জোরপূর্বক গুম নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনসমূহ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। প্রথমত: জোরপূর্বক গুম বা বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের যে কোনে

অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করা। দ্বিতীয়ত: জোরপূর্বক গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ, নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর ও অমানবিক বা মর্যাদাহানীকর আচরণ অথবা শাস্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত প্রোটোকল স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা এবং এর পর্যবেক্ষণের কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দেয়া। এই দুটি সুপারিশের বিপরীতে রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য ছিলো খুবই দুর্বল তবে স্বীকার করেছে জোরপূর্বক গুম থেকে যে সকল ব্যক্তির সুরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের অনুসমর্থনের বিষয়টি বাংলাদেশের বিদ্যমান ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সরকারের প্রতিনিধি বলেছেন, অপহরণ ও নিখোঁজ সংক্রান্ত মামলাগুলো বাংলাদেশের দন্ডবিধিতে খুবই ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং তা বাংলাদেশে স্বীকৃত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে জোরপূর্ববক গুম এবং অপহরণ ও নিখোঁজ দুটি ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ। অপহরণ যা আন্তর্জাতিক জোরপূর্বক গুমের থেকে ভিন্ন, যা বাংলাদেশ রাষ্ট্র বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে ২০১৮ সালে তৃতীয় সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনায়ও বাংলাদেশের গুম বা জোরপূর্বক গুম নিয়ে কিছু সুপারিশ করা হয়, তা হলো-

ক) "বিচারবহির্ভূত হত্যা, জোরপূর্বক গুম এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইউপিআর ২য় পর্যায়ে গৃহীত সুপারিশগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন করা"

খ) "সকল বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং জোরপূর্বক গুমের অভিযোগের ঘটনা দ্রুত এবং যথাযথভাবে তদন্ত করা এবং দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা"

বাংলাদেশ সরকার যে সুপারিশ মন্তব্যসহ গ্রহণ করেছে তা হলো- জোরপূর্বক গুম এবং নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা এবং দায়ীদের বিচারের উদ্যোগ নেয়া। তৃতীয় সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনায়, যে দুটি সুপারিশ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে তা হলো-আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচার

তৃতীয় সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনায়, যে দুটি সুপারিশ বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছে তা হলো-আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচার বহির্ভূত হত্যা, অপহরণ এবং জোরপূর্বক গুম বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা এবং একই সাথে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা নিশ্চিত করা এবং আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে যারা জোরপূর্বক গুম, হেফাজতে নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার জন্য দায়ী তাদের জববাদিহিতার আওতায় আনা যায়।

বহির্ভূত হত্যা, অপহরণ এবং জোরপূর্বক গুম বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা এবং একই সাথে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা নিশ্চিত করা এবং আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে করে যারা জোরপূর্বক গুম, হেফাজতে নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার জন্য দায়ী তাদের জববাদিহিতার আওতায় আনা যায়।

এই দুটি সুপারিশ গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সরকারের বক্তব্য নিম্নরুপ- বাংলাদেশে প্রায়শই 'বিচার বহির্ভূত হত্যা' অথবা 'জোরপূর্বক গুম এর মতো ঘটনা ঘটছে-এরকম ধারণার সাথে সরকার একমত নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের আইনে 'জোরপূর্বক গুম, এর মতো অপরাধ যেটি বাংলাদেশের আইনে সুস্পস্ট সংজ্ঞায়িত সেগুলোকে বিশেষ উদ্দেশ্যে 'জোরপূর্বক গুম' হিসেবে প্রায়শই ব্যবহার করা হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ যে কেউ আইনের কোন প্রকার লঙ্ঘন করলে আমাদের প্রচলিত আইনের প্রবিধানের অধীন বিচার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আইন কোন দন্ডবিধি লঙ্ঘনের জন্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের বিচারিক প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার অব্যাহতি দেয় না। দ্বিতীয় সর্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনায় গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে, সরকার নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (প্রতিরোধ) আইন ২০১৩ গ্রহণ করেছেন। এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ প্রমানিত হলে কমপক্ষে ৫ বছরের জেল এবং জরিমানার বিধান রয়েছে। এই আইনে নির্যাতিত সরাসরি পুলিশ সুপার অথবা আদালতে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে পারে। অভিযোগকারী এবং স্বাক্ষীর নিরাপত্তার প্রবিধানও এর আইনে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এই আইনে নির্যাতিতের ক্ষতিপূরণ পাবারও বিধান রয়েছে।"

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ পর্যালোচনার সুপারিশ ২০১৭:

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ সালে গৃহীত হয় যা বাংলাদেশ ২০০০ সালে অনুমোদন করে। অনুমোদনের এক বছর পর প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদানের নিয়ম থাকলেও ১৫ বছর পর বাংলাদেশ ২০১৫ সালে এ বিষয়ক কমিটির কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। ২০১৭ সালের ৬ ও ৭ মার্চ জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম অধিবেশনে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশের নাগরিকদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি, যেসব বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, জোরপূর্বক গুম, হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মৃত্যুদন্ড, কারাগার পরিস্থিতি।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি তাদের সমাপনী পর্যবেক্ষণে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরেছে-

১. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলপ্রয়োগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সাধারণ মুলনীতির আলোকে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী, সামরিক

বাহিনী এবং বিশেষ বাহিনী দ্বারা বল প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করতে আইনী কাঠামো পর্যালোচনা করা।

২. জোরপূর্বক গুমকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা। এসব ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার করে অপরাধীকে শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৩. গুমের শিকার ব্যক্তির তথ্য সংরক্ষণ করা এবং সরকারের পরবর্তী মধ্যবর্তী প্রতিবেদনে সরকার এ সংক্রান্ত কতটি ঘটনার তদন্ত করেছে, কয়টি বিচারকার্য সম্পাদন হয়েছে এবং অপরাধীদের কি ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে- সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা।

৪. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু প্রতিরোধ আইন-২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা। এ সংক্রান্ত সকল অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৫. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হত্যাকান্ড, আক্রমন ও হয়রানি থেকে সাংবাদিক, ব্লগার ও মানবাধিকার কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনীকে মানবাধিকার কর্মীদের রক্ষায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ২০১৯:

১৯৮৪ সালে গৃহীত হওয়া নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হয় ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর। এই সনদের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ি স্বাক্ষরের এক বছর পর প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদানের নিয়ম থাকলেও প্রথমবারের মত, বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক প্রতিবেদন ২৩ জুলাই ২০১৯ সালে জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির কাছে পেশ করেছে। গত ৩০ ও ৩১ জুলাই, ২০১৯ জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির ৬৭তম অধিবেশনে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী সনদের আওতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের উপস্থাপিত প্রাথমিক প্রতিবেদন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহের আলোকে নির্যাতন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী সনদ বিষয়ক কমিটি। গত ৯ আগস্ট, ২০১৯ জাতিসংঘের কমিটির চুড়ান্ত পর্যবেক্ষণে সরকারের কাছে ৭৭টি সুপারিশ করা হয়েছে। এই চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে জোরপূর্বক গুম বিষয়কে অগ্রাধিকার ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং একবছর পর সরকারকে প্রতিবেদনের মাধ্যমে অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরতে বলা হয়েছে।

১. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনতিবিলম্বে অঘোষিত আটকের ঘটনা বন্ধ করবে বলে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে ঘোষণা দেয়া হোক;

২. সব স্বীকৃত আটকের স্থানগুলোর তালিকা প্রকাশ করা একং কেউ কোথাও কোনভাবে যাতে অবৈধ আটক (Incommunicado detention) না থাকে তা নিশ্চিত করা;

৩. সকল আটক ও আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনার সাথে যুক্ত বাহিনীর একটি স্বাধীন তদন্ত সংস্থা দ্বারা দ্রুততার সাথে পরিপূর্ণ তদন্ত সম্পাদন করা;

৪. গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনের মাধ্যমে 'গুম'কে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করা;

৫. নির্যাতনবিরোধী চুক্তির ঐচ্ছিক প্রটোকলটি স্বাক্ষর করা।

জাতিসংঘের কমিটি অন এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেন্সেস এবং বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি

জোরপূর্বক গুমের বিরুদ্ধে আইনানুগ সুরক্ষা এবং গুমকে প্রতিহত করতে সর্বোচ্চ বিধিবিধান তৈরি করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ সব সদস্য রাষ্ট্রকে জোরপূর্বক গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ ২০০৬ অনুসমর্থন (Ratification) করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এ পর্যন্ত ৮১টি রাষ্ট্র কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে ৫৯টি সদস্য রাষ্ট্র ইতিমধ্যে অনুসমর্থন (Ratification) করেছে। এর মধ্যে এশিয়ার ৯টি সদস্য রাষ্ট্র কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং যার মধ্যে মাত্র ৩টি রাষ্ট্র অনুসমর্থন করেছে। বাংলাদেশে এখনও এটা স্বাক্ষর (Signature) বা অনুসমর্থন (Ratification) কোনটি করেনি।

১৯৮০ সাল থেকে এই পর্যন্ত, জাতিসংঘের কমিটি অন এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেন্সেস

এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলানটারি ডিসএপিয়ারেন্সেস সারা বিশ্ব থেকে ৫৭,১৪৯ টি অভিযোগ ১০৮টি রাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করেছে। ২০১৮ সালে ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলানটারি ডিসএপিয়ারেন্সেস ৪০টি দেশের ৮৯২টি অভিযোগ প্রেরণ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলানটারি ডিসএপিয়ারেন্সেস বাংলাদেশ সরকারকে তাঁদের অভিযোগ তদন্তে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আহ্ববান জানিয়েছিল ২০১৩ সালে এবং প্রতিবছর আহবান জানিয়ে এসেছে, কিন্ত এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি এবং অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। জাতিসংঘের গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলানটারি ডিসএপিয়ারেন্সেস ক্ষতিগ্রস্থের স্বজন ও এর পক্ষে কাজ করা নাগরিক সমাজের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। কমিটি সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে তাদেরকে তদন্ত করতে ও তথ্য সরবরাহ করতে আহবান জানিয়ে থাকে। 'নিঁখোজ' ব্যক্তির হদিস না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

সুপারিশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

উপরোল্লিখিত সবকটি পর্যালোচনায় বাংলাদেশের প্রতি মানবাধিকার ও সনদবিষয়ক কমিটির সুপারিশ এবং উদ্বেগ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড, জোরপূর্বক গুম, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি বারবার উঠে আসলেও সরকার বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুমের ঘটনা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে বিব্রত করার জন্য বা ব্যক্তিগত কারণে মানুষকে অপহরণ করা হচ্ছে। আবার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার কোন কার্যকর পদ্ধতি/পদক্ষেপ তুলে ধরতে পারেনি। বিভিন্ন বিভাগীয় তদন্ত ও নারায়নগঞ্জের সাত খুনের ঘটনার বিচারের উদাহরণ টেনে সরকার এক্ষেত্রে তাদের সোচ্চার ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করলেও, তা মোটেও সন্তোষজনক নয়। বাস্তবতা হলো অত্যন্ত আলোচিত ঘটনা, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহ, গণমাধ্যম ও মানবাধিকার কর্মীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা, আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া অধিকাংশ গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও নির্যাতনের ঘটনায় কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুম হওয়া ব্যক্তি ফিরে আসলেও সে আর ভয়ে মুখ খুলছে না। প্রশ্ন হচ্ছে সরকার কেন জড়িতদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনছে না? জড়িতরা কিভাবে সরকারের চেয়েও বেশি শক্তিশালী? আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন প্রতিরোধ আইন এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে চলছে বলে সরকার দাবি করলেও তা বাস্তবতা বিবর্জিত। স্মরণ রাখা দরকার, নির্যাতন ও হেফাজত মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এর আওতায় এ পর্যন্ত ১৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে রাষ্ট্রপক্ষ নির্যাতন বিরোধী কমিটিকে জানালেও এ সংক্রান্ত কোন তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ এবং এখন পর্যন্ত এসব মামলার একটিরও বিচার সমাপ্ত হওয়ার তথ্য দিতে সরকার ব্যর্থ হয়। এছাড়া নিযার্তন ও গুমের শিকার ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ গ্রহণে পুলিশের অস্বীকৃতি এবং পরবর্তী সময়ে হুমকি, হয়রানি ও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি প্রায়ই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষ ভূক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন বিষয়ে জাতীয় আইন কমিশনের একটি খসড়া প্রস্তাব দীর্ঘদিন ধরে কোন অগ্রগতি ছাড়াই পড়ে আছে।

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সদস্যদের বিভিন্ন অপরাধের বিপরীতে নিজস্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা সরকার বলে থাকলেও, বাস্তবে অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অভিযুক্তকে 'ক্লোজ' করার একটি অস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহনের সংবাদ আমরা পাই। আবার কিছু ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি চাকুরি থেকে অব্যাহতি বা পদাবনতি দেয়া হয়েছে, যা নির্যাতনের মতো অপরাধের জন্য কোনোভাবেই পর্যাপ্ত নয়। নির্যাতনবিরোধী আইনে ভূক্তভোগীকে সরাসরি আদালতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে আবেদন করার ক্ষমতা প্রদান করলেও, তা বাস্তবে কার্যকর ফল বয়ে আনছে না, কেননা,

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন সদস্যদের বিভিন্ন অপরাধের বিপরীতে নিজস্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা সরকার বলে থাকলেও, বাস্তবে অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অভিযুক্তকে 'ক্লোজ' করার একটি অস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহনের সংবাদ আমরা পাই। আবার কিছু ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তি চাকুরি থেকে অব্যাহতি বা পদাবনতি দেয়া হয়েছে, যা নির্যাতনের মতো অপরাধের জন্য কোনোভাবেই পর্যাপ্ত নয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আইনে বেধে দেওয়া সময়ের মধ্যে তাদের তদন্ত শেষ করেন না বা অভিযুক্তরা মামলা দায়েরকারীকে নানা হুমকি প্রদান করে মামলার প্রভাব বিস্তার করেন।

নির্যতিন বিরোধী সনদের আওতায় মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে, যাদের অধিকাংশই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে। অথচ এ পর্যালোচনায় আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় সম্পৃক্ততা প্রত্যক্ষ করিনি, একই সাথে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গত পাঁচ বছরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ১৮৫টি ঘটনার ক্ষেত্রে প্রতিবেদন চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় এই সময়ে একটি চিঠিরও কোনো জবাব দেয়নি।

আমরা উপরের আলোচনায় দেখতে পেয়েছি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় মানবাধিকার সংগঠনের পর্যালোচনায় জোরপূর্বক গুম সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ এসছে এবং এই সুপারিশগুলোর একটি ধারবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সুপারিশ বাস্তবায়নে কিংবা উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য

> আমরা সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি, রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দ্বারা সকল বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, নির্যাতন ও গুমের ঘটনায় একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের এবং জাতীয় আইন ও মানবাধিকার কমিশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে জোরালো ভূমিকা পালনের ।

ব্যবস্থা বাংলাদেশ সরকার এখনও গ্রহণ করেননি । এমনকি ২০১৭ সালে কমিটি যে তিনটি বিষয়ে একবছরের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা দেয়ার (এবিষয়ে আগে কোন রেফারেন্স দেয়া হয়নি, বরং সেখানে ২০১৯ সালে নির্যাতন বিরোধী কমিটির তিনটি অগ্রাধিকার সুপারিশের কথা বলা হয়েছে) সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, তা বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও, এখন পর্যন্ত সরকারপক্ষ থেকে অগ্রগতি প্রতিবেদন দেয়া হয়নি ।

আমাদের দাবি ও প্রত্যাশা

জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত অপরাধের কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে তথ্য জানা গেলেও এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রেই তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায়নি । আন্তর্জাতিক ফোরামের সাহায্যে বাংলাদেশে কোন ঘটনার ক্ষতিপূরণও আদায় করা যায়নি । যদিও জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত অপরাধ নির্ণয় একটা জটিল, দীর্ঘমেয়াদী ও মন্থর প্রক্রিয়াই নির্দেশ করে তবুও নানান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় গুমের শিকার ব্যক্তিদের জন্যে বিচার পাওয়ার সুযোগ রয়েছে । সময় সাপেক্ষ হলেও ক্ষতিগ্রস্থ ও তাদের পরিবারের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে সত্য প্রকাশে বড় ধরনের ভূমিকা রেখে চলেছে । গুমসহ ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরণের অন্যায় অবিচার প্রতিরোধ করতে প্রত্যেক মানবাধিকার কর্মীসহ নাগরিককে সোচ্চার হতে হবে ।

এই আকাঙ্খা সামনে রেখেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে 'জোরপূর্বক গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির জন্য আন্তর্জাতিক সনদ ২০০৬' স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনের এবং সেই প্রেক্ষাপটে জাতীয় আইন প্রক্রিয়া ও কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি । এছাড়া, সরকারের দায়িত্ব হলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রে জোরপূর্বক গুম এর মতো জঘন্য অপরাধ হয়েছে এবং হচ্ছে, তা স্বীকার করে নেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্থ ও তাদের পরিবারসমূহও যাতে ন্যায়বিচার পায় এবং অপরাধীদের যেন উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনা যায় । আমরা সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি, রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দ্বারা সকল বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, নির্যাতন ও গুমের ঘটনায় একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের এবং জাতীয় আইন ও মানবাধিকার কমিশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে জোরালো ভূমিকা পালনের ।

এছাড়াও, জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত বিষয়ে ইউপিআর, নির্যাতনবিরোধী সনদ ও নাগরিক রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তিকে কেন্দ্র করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনসমূহ যে সকল সুপারিশ করেছেন তা বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে সরকার, একই সাথে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং কর্মীবৃন্দ শুধু প্রতিবেদন প্রদান আর পর্যালোচনায় অংশগ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সরকারকে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নিতে প্রভাবিত করবে, যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অস্বীকার করার প্রবণতা থেকে সরকার বেড়িয়ে এসে এর প্রতিকার এবং নিপীড়িত পরিবার এবং স্বজনের ক্ষতিপূরণের বিধানের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে, নাগরিক সমাজের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে সরকার প্রতিটি কমিটির সমাপনী পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য একটি সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে । সর্বশেষ প্রত্যাশা করছি, বাংলাদেশ অনতিবিলম্বে গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ ও নির্যাতনবিরোধী চুক্তির ঐচ্ছিক প্রটোকলটির পক্ষ রাষ্ট্র হবে ।

বাংলাদেশ সরকারের মনে রাখা দরকার, ঐতিহাসিকভাবে ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশ, বিশেষ করে চিলি ও আর্জেন্টিনার সামরিক জান্তার ইতিহাসের সাথে জোরপূর্বক গুমের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত জড়িয়ে আছে । এরই ধারাবাহিকতায় সত্তরের দশকে জোরপূর্বক গুম করাকে 'নৃশংস মানবাধিকার লঙ্ঘন' ও 'মানবতা বিরোধী অপরাধ' হিসাবে প্রথম চিহ্নিত করা হয়ে থাকলেও, গুমের ঘটনা শুধু ল্যাটিন আমেরিকার সামরিক জান্তা বা অগণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বা ওই সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । বরং বিগত দশকগুলোতে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারসমূহ যেমন ফিলিপিনস, শ্রীলংকা, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহকে জোরপূর্বক গুম করার সাথে জড়িত থাকতে দেখা গিয়েছে । বছরের পর বছর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা গুমের শিকার পরিবারগুলো ও নাগরিক সমাজের লড়াই-সংগ্রাম করেছেন এবং নাগরিক সমাজ ও গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনেরা তাদের প্রিয়জনদের গুমের বিচার চাওয়ার লড়াই থেকে কখনও পিছপা হয়নি, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহও ন্যায়বিচার পাবার জন্য এগিয়ে এসেছেন । বাংলাদেশ সরকারের জোরপূর্বক গুমের পেছনের তথাকথিত যৌক্তিকতার প্রয়াসও অন্যায্য প্রমান হয়েছে । একই সাথে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহও কিছুটা হলেও প্রমাণ করেছেন যে, অপকৌশল শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় । যা কিনা পরবর্তীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ের আন্তর্জাতিক কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে জোরপূর্বক গুম করাকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা এবং ন্যায়বিচার পাবার ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে ।

- নিবন্ধটি ৫ অক্টোবর, ২০১৯ জাতীয় প্রেস ক্লাবে মৌলিক অধিকার সুরক্ষা কমিটি আয়োজিত জোরপূর্বক গুম বিষয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতা ও জাতিসংঘের সুপারিশ- শীর্ষক আলোচনা সভায় *পঠিত*

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের যুগান্তকারী রায়

রোহিঙ্গাদের নিজভূমে প্রত্যাবসনে ঐতিহাসিক সুযোগ

মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় 'অন্তবর্তীমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণের আদেশের মাধ্যমে বিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস-আইসিজে)। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট আইসিজে বিচারক প্যানেল গত ২৩ জানুয়ারি সর্বসম্মতভাবে মায়ানমারের প্রতি কিছু 'অন্তবর্তীমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণের জন্য আদেশ দেয় যাতে করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি নতুন কোন সহিংসতার শিকার না হয়। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রেক্ষিতে প্রতিকার চেয়ে আফ্রিকান রাষ্ট্র গাম্বিয়া নভেম্বর ২০১৯-এ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মায়ানমারের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের আন্তর্জাতিক গণহত্যা সনদ লঙ্ঘনের দায়ে অভিযোগ দায়ের করে। ডিসেম্বর মাসে পরপর তিনদিন শুনানী গ্রহণ করে আদালত এবং গত ২৩ জানুয়ারি ২০২০ আইসিজে তার আনুষ্ঠানিক রায় প্রদান করে। রায়ে আদালত এমন মন্তব্য করে যে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত সহিংসতা ও বৈষম্যের নীতিতে গণহত্যার উদ্দেশ্য থেকে থাকতে পারে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সহিংসতা থেকে সুরক্ষায় আদালত সর্বসম্মতিভাবে ৪ দফা অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদান করে যা মেনে চলা মায়ানমারের জন্য বাধ্যতামূলক। আদালতের আদেশ অনুযায়ী অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাগুলো হলো -

১. ১৯৪৮ সালের গণহত্যা সনদের বিধি-২ অনুযায়ী মিয়ানমারকে তার সীমানার মধ্যে (ক) রোহিঙ্গাদের হত্যা, (খ) শারীরিক নির্যাতন বা মানসিকভাবে আঘাত করা (গ) পুরো জনগোষ্ঠী বা তার অংশবিশেষকে নিশ্চিহ্ন করা এবং (ঘ) তাদের জন্মদান বন্ধের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

২. মিয়ানমারকে অবশ্যই তার সীমানার মধ্যে সেনাবাহিনী বা অন্য কোনো অনিয়মিত সশস্ত্র ইউনিট বা তাদের সমর্থনে অন্য কেউ যাতে গণহত্যা সংঘটন, গণহত্যার ষড়যন্ত্র, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে গণহত্যার জন্য উসকানি দেওয়া, গণহত্যার চেষ্টা করা বা গণহত্যার সহযোগী হতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. গণহত্যা সনদের বিধি-২ এর আলোকে গণহত্যার অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত সব সাক্ষ্যপ্রমাণ রক্ষা এবং তার ধ্বংস সাধনের চেষ্টা প্রতিরোধ করতে হবে।

৪. আদালতের আদেশ জারির দিন থেকে চার মাসের মধ্যে আদালতের আদেশ অনুযায়ী মিয়ানমার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তা আদালতকে জানাতে হবে। এরপর থেকে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ছয় মাস পরপর এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে হবে।

২৩ শে জানুয়ারি ২০২০ নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ-এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালত এর আনুষ্ঠানিক অধিবেশনে বিচারপতি আব্দুলকাভি ইউসুফ এর নেতৃত্বে ১৭ সদস্যের বিচারক প্যানেল এই রায় প্রদান করেন। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গত কয়েক দশক ধরে চলা মায়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনীর অব্যাহত জাতিগত নিপীড়ন, বৈষম্য ও ২০১৭ সালের গণহত্যা বিষয়ে যখন কেউ কার্যকরভাবে এগিয়ে আসেনি তখন আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া ১৯৪৮

সালের গণহত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের লঙ্ঘন হিসেবে তুলে ধরে মায়ানমারের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণে আন্তর্জাতিক আদালতের স্মরণাপন্ন হয়। উল্লেখ্য যে, মায়ানমার এবং গাম্বিয়া উভয়েই এই সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এই সনদের বাধ্যবাধকতা মানতে মায়ানমার বাধ্য। আইসিজে'র দেয়া রায় বাস্তবায়ন মায়ানমারের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণযোগ্য নয়। এই রায় সহিংসতার শিকার মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রথম কোন আন্তর্জাতিক বিচারিক পদক্ষেপ। আইসিজে ১৯৯০ সালে সার্বিয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা থেকে রক্ষার জন্য একই ধরণের অন্তর্বর্তীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিয়েছিল তবে এবারের রায়েই প্রথম বারের মতো সকল বিচারক ঐকম্যতে পৌছাতে পেরেছে, এমনকি মায়ানমারের নিযুক্ত বিচারকও মায়ানমারের বিরুদ্ধে আদালতের আদেশে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশের স্বপক্ষে আদালত উল্লেখ করে যে, রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার সরকার যে পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হোক না কেন, গণহত্যা সনদের বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণে রাষ্ট্রটি বাধ্য। আদালত মনে করে যে, মিয়ানমার বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবসন, জাতিগত সমঝোতা এবং রাখাইন রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা যথেষ্ট নয়। আদালত এ বিষয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি উদ্বাস্তু এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের তাঁদের আদি জায়গায় স্বেচ্ছায়, নিরাপদে এবং মর্যাদার সঙ্গে ফিরে আসার মতো প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণের মতো হয়নি।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা, গণহত্যা ও ধর্ষণের মতো অপরাধকে জাতিগত নির্মূলের 'টেক্সটবুক' উদহারণ হিসেবে অভিহিত করেছে। মায়ানমারে জাতিসংঘ তথ্যানুসন্ধান মিশনের প্রধানও সতর্ক করেছিলেন যে, গণহত্যার পুনরাবৃত্তি হওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে এবং এই তথ্যানুসন্ধান মিশন ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে আইনী ফোরামে মায়ানমারকে দায়ী করা উচিত বলে মতামত দেয়। অন্যদিকে বরাবরের মতো মায়ানমার সরকার ২০১৭ সালে চরম মানবাধিকর লঙ্ঘনের অভিযোগটি কঠোরভাবে অস্বীকার করে। তারা ২০১৭ সালের গণহত্যার বিষয়টিকে জঙ্গীদের দমনে সেনাবাহিনী বৈধ একটি পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করে।

মায়ানমার আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার কার্যক্রমের শুরু থকেই গাম্বিয়ার অভিযোগ আনার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে রায়ের শুরুতেই এই বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালত তার এখতিয়ারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন। আদালত বলেন যে, গণহত্যা ঘটেছে কি ঘটেনি, তা বিচারের ওপর আদালতের এখতিয়ার সীমাবদ্ধ নয়, গণহত্যা সনদের বাধ্যবাধকতা অনুসরণে কোনো স্বাক্ষরকারী দেশ ব্যর্থ হয়েছে দাবি করে সনদে অংশগ্রহণকারী অন্য যেকোনো দেশ আপত্তি জানালে তা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আদালতের রয়েছে। অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি)'র প্রক্সি হিসেবে গাম্বিয়া এই মামলা করতে পারে না বলে মায়ানমারের দাবী আদালত নাকচ করে দেন। আদালত জানায় যে, গাম্বিয়া তার নিজস্ব পরিচয়েই মামলা করেছে এবং ওআইসিসহ যে কোন সংস্থার সহায়তা নেয়ার অধিকার তার রয়েছে। আদালত আরো উল্লেখ করে, শুধু সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রই মামলা করার অধিকার রাখে, এমন দাবি ঠিক নয়। গণহত্যা সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণে অভিন্ন স্বার্থে সনদে অংশগ্রহণকারী যেকোনো রাষ্ট্র মামলা করার অধিকার রাখে এবং গাম্বিয়ার সেই অধিকার আছে। আদালতের রায় গত কয়েক বছরে মায়ানমারে গণহত্যা, উচ্ছেদ, বাড়ি-ঘর ও সম্পদ ধ্বংস ও ব্যাপক সহিংসতা বিষয়ে জাতিসংঘ তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ও তথ্য -উপাত্তের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে।

গাম্বিয়া এই মামলা করতে পারে না কেননা মায়মানমারের সাথে তার কোন বিরোধ নেই- মায়ানমারের এমন দাবীও নাকচ করে দিয়েছে আদালত। গণহত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের বাধ্যবাধকতা মেনে চলার জন্য গাম্বিয়া ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে মায়ানমারকে কুটনৈতিক চিঠি দিয়েছিল যার কোন জবাব না দেয়া উভয় দেশের মধ্যে একটি বিরোধ বলে আদালত মন্তব্য করে। মিয়ানমার আরো দাবি করেছিল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত কার্যক্রম গণহত্যা সনদের আওতায় গণহত্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলে গণ্য করা যায় না। এ বিষয়ে আদালত বলেছেন, গণহত্যা ঘটেছে কি ঘটেনি, তা এই পর্যায়ে বিচার্য নয় এবং গাম্বিয়ার অভিযোগ অনুযায়ী কিছু কিছু কার্যক্রম সনদের শর্তগুলো পূরণ করে। গণহত্যা সনদের আওতায় রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা, তার প্রয়োগ ও প্রতিপালন বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশ্নে এসব কারণ প্রাথমিকভাবে (প্রাইমা ফেসি) বিচার্য বলে আদালত মত প্রকাশ করেন।

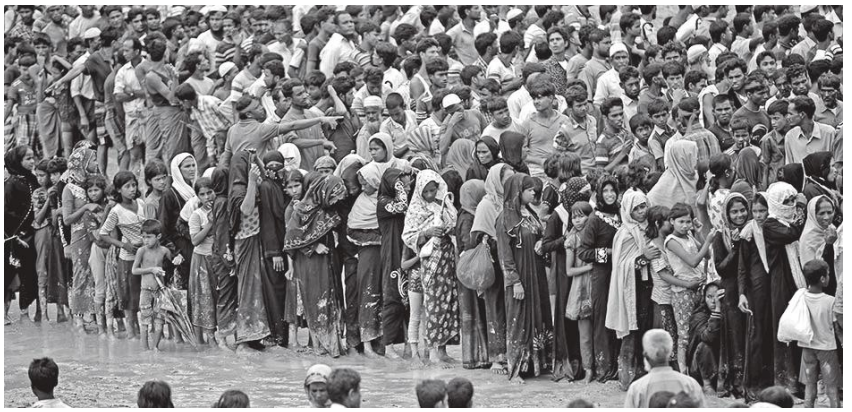

আদালত রায়ে আরো জানায় যে, গণহত্যা সনদের ৪১ বিধির আওতায় মূল অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না, তা বিচারের আগেই ওই জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় অন্তর্বতী নির্দেশনা দেওয়ার এখতিয়ার ও ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। আদালত এ ক্ষেত্রে শুনানিতে মিয়ানমারের আত্মপক্ষ সমর্থনে দেয়া বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। মিয়ানমার বলেছিল, ২০১৭ সালের কথিত ক্লিয়ারেন্স অপারেশনের সময়ে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে অনানুপাতিক হারে শক্তি প্রয়োগ করেছে এবং বেসামরিক নাগরিক ও আরসা যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করেনি, এমনটা বলা যাবে না। আদালত জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধানী দলের ২০১৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে 'আর্ন্তজাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন ঘটেছে বলে বিশ্বাস করার যৌক্তিক কারণ রয়েছে' বলে যে উপসংহার টানা হয়েছে, তা উল্লেখ করেন। এসব গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের আলোকে গাম্বিয়া যেসব পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন করেছিল, সেগুলোর প্রথম তিনটি রোহিঙ্গাদের অধিকার রক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে আদালত অভিমত দেন।

আইসিজে'র বিচারক প্যানেলের সহ-সভাপতি চীনের বিচারপতি সু হানকিন রাখাইনে গণহত্যা সনদের বিধানসমূহের আলোকে গণহত্যার উদ্দেশ্যে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়ে থাকতে পারে, এমনটি মনে করেন না বলে তার পর্যবেক্ষণে জানান। তবে যে মাত্রায় রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংসতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ সংঘটিত হয়েছে, তা অন্তর্বর্তী নির্দেশনা জারির জন্য যথেষ্ট বলে তিনি মতামত দিয়েছেন। আইসিজে'র অন্যতম স্থায়ী বিচারপতি কনচাতো ত্রিনদাদে জাতিসংঘ তথ্যানুসন্ধানী দল এবং জাতিসংঘের অন্য সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে বর্ণিত রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন ও বৈষম্য কতটা গুরুতর, তা তুলে ধরে 'গণহত্যার উদ্দেশ্য থাকলেও থাকতে পারে' বিষয়টা এতটা সাধারণ নয় বলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন। মিয়ানমারের মনোনীত বিচারপতি ক্লাউস ক্রেস অন্তর্বতী ব্যবস্থাগুলোর বিষয়ে সম্মত হয়েও আলাদা ঘোষণায় বলেছেন, এই অন্তর্বতী আদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে সুরক্ষামূলক। আদালত গণহত্যার উদ্দেশ্য ছিল কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত নিরীক্ষা করেননি। আদালতের এই আদেশ মূল মামলার গুণাগুণ বিচারের বিষয়ে কোনো প্রভাব ফেলে না।

আইসিজে'র শুনানীতে মায়ানমারের পক্ষে অং সান সুচির অংশগ্রহণে মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিস্মিত হয়েছিল। যদিও তিনি রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংসতার শুরু থেকেই মায়ানমারের সামরিক জান্তাদের পক্ষে সাফাই গেয়ে আসছিলেন। আইসিজে'র শুনানীতেও তিনি রোহিঙ্গাদের ওপর সহিংসতা কে 'অভ্যন্তরীন সশস্ত্র সংঘাত' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর পেছনে রোহিঙ্গা সশস্ত্র সংগঠন 'আরসা' কর্তৃক মিলিটারি পোস্টে আক্রমনকে দায়ি করেন। সূচী শুনানীতে মায়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগটি খারিজ করে দেয়ার জন্য আদালতের প্রতি আহ্বান জানান এবং রাখাইন রাজ্যে কোন মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়ে থাকলে তা দেশের কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে বিচারের প্রস্তাব করেন।

রোহিঙ্গাদের জাতিগত নির্মূল ও গণহত্যা থেকে সুরক্ষার দাবিতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের দ্বারস্থ হওয়া গাম্বিয়ার আইনমন্ত্রী আবুবকর মারি তামবাদু আদালতের অন্তর্বতীকালীন আদেশকে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ নিপীড়ন ও বঞ্চনার অবসানের পথে একটি ছোট পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন যদিও এই আদেশ রাতারাতি রোহিঙ্গাদের ভাগ্য বদলে দিবেনা কিন্তু একটি পথের সূচনা করেছে। আর এই পথ ধরেই একদিন নিরাপদে ও মর্যাদার সাথে নিজ ভূমিতে ফিরে যেতে পারবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। আদালতে গাম্বিয়ার আইন উপদেস্টা অধ্যাপক ফিলিপস স্যান্ডু কিউসি বলেন, ২য় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যান্ডে 'অসউইৎজ' (Auschwitz) গণহত্যার ৭৫ বছর পূর্তিতে আন্তর্জাতিক আদালত এমনটি একটি স্পষ্ট ও দৃঢ় আদেশ প্রদান করেছে যা হয়তো ভবিষ্যতে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে এই ধরনের গণহত্যা সংগঠনে বিরত রাখবে'। তিনি এই রায়কে আন্তর্জাতিক আইন, ব্যক্তি ও গণমানুষের অধিকার রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে বাংলাদেশের কক্সবাজারের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রিত প্রায় ১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এরকম একটি রায় শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। যদিও ক্যাম্পে ইন্টারনেট সংযোগে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাদের সরাসরি আদালতের রায় শোনার সুযোগ ছিলনা। একটি রোহিঙ্গা যুব সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা খিন মুয়াং বলেন,' ক্যাম্পের লক্ষ মানুষ সারারাত ঘুমাতে পারেনি, আর সকালে এরকম একটি রায় পেয়ে তারা খুব উল্লাসিত ছিল। আদালত যদি তাদের পক্ষে 'অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা'র আদেশ না দিত তাহলে এই লক্ষাধিক মানুষ চরমভাবে হতাশ হতো।

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক রিপোর্ট

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি: হাইকোর্টের নির্দেশনা

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নারীর অংশগ্রহণ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি, শিল্প, সেবাখাতে নারী সফলতার সাথে কাজ করছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে আছে বাংলাদেশ। সংসদ এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে কাজ করছে। বিবিএস'র তথ্য মতে, গত দশ বছরে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ১০৮ শতাংশ। চিংড়ি, চামড়া, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, চা ও তামাক শিল্পসহ অন্যান্য মোট রপ্তানি আয়ের ৭৫ শতাংশ অর্জনের মূল চালিকাশক্তি নারী। পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত প্রায় ৪০ লাখ কর্মীর মধ্যে ৮০ শতাংশই নারী।

কর্মক্ষেত্রে নারীর এই সাফল্য এবং ধারাবাহিকতা টিকিয়ে রাখার পথটা এত সহজ নয়। নারীরা তাদের কর্মক্ষেত্রে সবসময়ই নানা বৈষম্যের শিকার যেমন- চাকুরিপ্রাপ্তি, মজুরি, পদোন্নতি, ব্যবসা পরিচালনা, সম্পদ পরিচালনা ইত্যাদি। এই সব বৈষম্যের পাশাপাশি শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে কর্মক্ষেত্রে নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ যেমন দিন দিন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে কর্মক্ষেত্রে নারীদের উপর যৌন হয়রানির ঘটনা। আর শুধু কর্মক্ষেত্র কেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়ে শিক্ষার্থীর উপর যৌন হয়রানির ঘটনা তো হরহামেশাই ঘটছে। ফলে নারীর স্বাভাবিক উন্নয়নের ও ক্ষমতায়নের যে পথ তা প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে। নি:সন্দেহে নারীর উপর যৌন হয়রানির ঘটনা নারীর ক্ষমতায়নকে বিঘ্নিত করে, নারীর সফলতার পথকে করে রুদ্ধ। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধে বাংলাদেশে নেই কোন সুনির্দিষ্ট আইন, আছে কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালে হাইকোর্ট এর নির্দেশনা।

১৯৯৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন, ২০০১ সালে যৌন হয়রানির রেশ ধরে নারায়নগঞ্জে চারুকলার ছাত্রী সিমি বানুর আত্মহত্যা, ধর্ষিত হওয়ার পর ২০০২ সালে মহিমা খাতুনের আত্মহত্যা, ২০০৩ সালে ধর্ষিত গার্মেন্টসকর্মী শাহিনুরের ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উঠে যৌন হয়রানির অভিযোগ। এই ঘটনাগুলো উপলব্ধি করায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন কতটা জরুরি।

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটলেও তা লজ্জায় হোক, চাকরি হারানোর ভয়ে, কোনো প্রতিকার না পাওয়ার আশংকায় নারীরা তা প্রকাশ করতে চায় না। অনেকে হয়ত চুপচাপ মেনে নেয়, অনেকে কাজ ছেড়ে দেয়, অনেকে পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়। অথচ এসব না হয়ে এর প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন দোষীদের শাস্তি হওয়া।

নাগরিক উদ্যোগ ও বাংলাদেশ লেবার রাইটস ফোরাম পরিচালিত 'কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি নির্যাতন ও হয়রানি: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের পোষাক শিল্প' শীর্ষক এক গবেষণায় উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৭% বলেন কাজে যাওয়ার পথে পোশাক কর্মীরা যানবাহনে নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শরীরে স্পর্শকাতর স্থানে স্পর্শ, রসিকতা করা, অশ্লীল শব্দ ছুড়ে দেয়া, যৌন প্রলোভন, মোবাইলে ছবি তোলা, হাত ধরে টান দেয়া ইত্যাদি। কর্মক্ষেত্রে ৯০% উত্তরদাতা মানসিক নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও ৫১% উত্তরদাতা শারীরিক এবং ৪৩% যৌন হয়রানির কথা বলেন। এক্ষেত্রে ৪৩% উত্তর দাতা বলেন তাদের প্রতিদিনই শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে পুরুষদের দ্বারা ইচ্ছাকৃত স্পর্শের শিকার হতে হয়ে। বাসের কনডাক্টর হেল্পার, বিশেষ করে পুরুষ যাত্রীরাই এই কাজ বেশি করে থাকেন। ৩৫% উত্তরদাতা বলেন, বাসে পাশের সিটের পুরুষ যাত্রী মোবাইলে পর্ণ ছবি দেখে এবং তাদের দেখানোর চেষ্টা করে। বাসে পুরুষ যাত্রীরা প্রায়ই তাদের ছবি তোলে, ভিডিও করে এছাড়াও ফেসবুক, ইমু, হোয়াটসএ্যাপ আইডি দেয়ার অনুরোধ করে। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক কারখানায় যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে।

সজাগ নেটওয়ার্ক কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণার তথ্য অনুযায়ি, ২২ শতাংশ নারী পোশাক শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে অথবা কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানির শিকার হন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উপর বিশ্বাসের অভাবের কারণে তাদের মধ্যে ৬৭ শতাংশই নারী তাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কমিটির কাছে প্রতিকার চান না।

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের রায়:

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে যৌন হয়রানি প্রতিকারের সুস্পষ্ট কোন আইন নেই যা রক্ষাকবচ হিসেবে আমাদের সংবিধানে উল্লেখিত জেন্ডার সমতাকে নিশ্চিত করতে পারে। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে নারীর প্রতি যৌন নিপীড়নমূলক ঘটনা। এর প্রেক্ষিতে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় যা কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং যতদিন পর্যন্ত যথাযথ এবং পর্যাপ্ত আইন প্রণয়ন না হয় ততদিন পর্যন্ত এ নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্র কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি নির্যাতন রোধে ২০০৮ সালে কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা চেয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন্স লইয়ারস এসোসিয়েশন' মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রিট পিটিশন মামলা (মামলা নং

৫৯১৬/২০০৮) দায়ের করেন। মামলা প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট ২০০৯ সালে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেন যা, 'হাইকোর্ট ডিরেক্টিভস ২০০৯' নামে পরিচিত। উল্লেখিত ডিরেক্টিভসে প্রতিটি সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিযোগ কমিটি গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। এখন পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি র্কমক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পূর্ণাঙ্গ কোন আইন না থাকায় সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ি হাইকোর্টের নির্দেশনাটিই আইন হিসেবে কাজ করবে।

নির্দেশিকাটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো- ক) যৌন হয়রানি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা; খ) যৌন হয়রানির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা; গ) 'যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ'-এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

নির্দেশিকায় যৌন হয়রানির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- ১) যৌন হয়রানি বলতে বোঝায়- ক) অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ। যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের পরোক্ষ প্রচেষ্টা; খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা; গ) যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি; ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন; ঙ) পর্নোগ্রাফি দেখানো; চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গি; ছ) অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে কৌতুক বলা বা উপহাস করা; জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা; ঝ) ব্লাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা; ঞ) যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা; ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা; ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

সকল নিয়োগকর্তা এবং কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে, অন্যান্য পদক্ষেপ ছাড়াও তারা নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন: ক) এ নির্দেশনায় উল্লিখিত ৪ ধারা অনুযায়ী যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে তা কার্যকরভাবে প্রচার এবং প্রকাশ করা; খ) যৌন হয়রানি সংক্রান্ত যে সকল আইন রয়েছে এবং আইনে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের জন্য যে সকল শাস্তির উল্লেখ রয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে; গ) কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রের পরিবেশ নারীর প্রতি যেন বৈরী না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মজীবী নারী ও নারী শিক্ষার্থীদের মাঝে এ বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে তুলতে হবে যে, তাদের অবস্থা পুরুষ সহকর্মী ও সহপাঠীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়া বা অসুবিধাজনক নয়।

অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনার জন্য কমিটি গঠন করা হবে। এক্ষেত্রে ক) অভিযোগ গ্রহণের জন্য, তদন্ত পরিচালনার জন্য এবং সুপারিশ করার জন্য সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে এবং সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করবেন; খ) কমপক্ষে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে যার বেশির ভাগ সদস্য হবে নারী। সম্ভব হলে কমিটির প্রধান হবেন নারী; গ) কমিটির দুইজন সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে, যে প্রতিষ্ঠান জেন্ডার বিষয়ে এবং যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করে; ঘ) অভিযোগ কমিটি সরকারের কাছে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন পেশ করবেন।

তবে পরিতাপের বিষয় হলো ২০০৯ সালে এই নির্দেশনা প্রণয়ন হলেও প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নির্দেশনা অনুযায়ি তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। এখন পর্যন্ত ১৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৯টির কমিটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি পাবলিক ও ৪৯টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। বাকি ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কমিটি নেই। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা জানেই না যে এরকম কোন কমিটি তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে। একশন এইডের গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থীই আদালতের নির্দেশনা জানে না। ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী এর কথা জানলেও তা নামেমাত্র জানে।

শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না, মিডিয়া হাউস, পাবলিক, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এর অনেকগুলোতেই যৌন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। মূলত এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় না। আবার যেখানে কমিটিগুলো আছে সেগুলো বেশিরভাগই নিষ্ক্রিয়।

সাম্প্রতিক সময়ে ফেনীর সোনাগাজিতে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয়েছে মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত, এরকম অনেক যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায়,আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আড়ালেই থাকে। সোনাগাজীর এই ঘটনার পর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর গত ১৮ এপ্রিল দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়নবিরোধী কমিটি গঠন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। ইতিপূর্বে শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এবার স্কুল পর্যায়ে কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরও একই ধরনের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি নারীকে শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। সমতাভিত্তিক ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গঠন করতে নারীর প্রতি সকল ধরনের নির্যাতন বন্ধ করা প্রয়োজন। তাই নারীর প্রতি যৌন হয়রানি রোধ করতে কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুত ও কার্যকরীভাবে যৌন নিপীড়নবিরোধী কমিটি গঠন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক রিপোর্ট

বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা: সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্ত

দেশের ২৫.৪ শতাংশ নারী (১৮-৪৯ বছর বয়সী) মনে করেন স্বামীকে না বলে বাইরে যাওয়া, বাচ্চাদের ঠিকভাবে যত্ন-পরিচর্যা না করা, স্বামীর সাথে তর্ক করা, যৌন সম্পর্কে অস্বীকৃতি জানানো এবং ভাত পুড়িয়ে ফেলা- এই পাঁচ কারণের অন্তত একটির জন্য স্বামীর হাতে মার খাওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১৯-এ এই চিত্র উঠে এসেছে। সারা দেশের ৬১ হাজার ২৪২টি পরিবারের কাছে ৩৩ ধরনের তথ্য নিয়ে এই জরিপ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ১৯ জানুয়ারি থেকে ১ জুনের মধ্যে এই সমীক্ষা হয়। সমীক্ষায় শিশুমত্যু, জন্মহার, শিক্ষার হার, বাল্যবিবাহ, রেডিও-টেলিভিশন- মোবাইল ফোন ব্যবহার, বিবাহ, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে।

স্বাক্ষরতার হার ও গণমাধ্যম ব্যবহার:

১৫-২৪ বছর বয়সী নারীদের যারা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পড়াশুনা জানেন বা মাধ্যমিক বা উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশোনা করছে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮২ শতাংশ থেকে এই হার বেড়ে ৮৮.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের যারা সপ্তাহে অন্তত একবার দৈনিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিন পড়তেন এবং রেডিও শুনতেন বা টেলিভিশন দেখতেন তাদের হার ১.৬ শতাংশ থেকে ০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে নারী:

১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ৭১ শতাংশের বেশি নারীর নিজস্ব মোবাইল ফোন আছে। তবে প্রায় ৯৮ শতাংশ নারী গত তিন মাসে একবার অন্তত মোবাইল ফোনে কথা বলেছেন। কম্পিউটার আছে সাড়ে ৫ শতাংশের বেশি পরিবারে। ১.৯ শতাংশ নারী গত তিন মাসে কম্পিউটার ব্যবহার করেছেন। ৩৭ শতাংশ পরিবারে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য ডিভাইস আছে। গত তিন মাসে ১২.৯ শতংশ নারী একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন এবং ১১.৫ শতাংশ নারী সপ্তাহে অন্তত একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন।

বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য:

১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী নারীদের এক-তৃতীয়াংশই (৩২.৯ শতংশ) এখন বিবাহিত। সাত বছর আগে এই হার ছিল ৩৪ দশমিক ৩ ভাগ। ৩.১ শতাংশ নারীর স্বামীর একাধিক স্ত্রী রয়েছে।

বর্তমানে যেসব নারীর বয়স ২০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে, তাঁদের সাড়ে ১৫

শতাংশের বিয়ে হয়েছে বয়স ১৫ বছর হওয়ার আগে। এ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ২০১২-১৩ সালে ১৮ শতাংশের বেশি ওই বয়সী নারীদের বিয়ে হয়েছিল।

বর্তমানে ২০-২৪ বয়সীদের মধ্যে ১৮ বছর হওয়ার আগে বিয়ে হয়েছে ওই শ্রেণির ৫১ শতাংশের বেশি নারীর। সাত বছর আগে ছিল এই হার ছিল ৫২ শতাংশের বেশি। তবে ১৮ বছর হওয়ার আগে সন্তান জন্মদান পরিস্থিতির খুব বেশি উন্নতি হয়নি। ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী প্রতি চারজন নারীর একজনই ১৮ বছর হওয়ার আগেই সন্তান জন্ম দিয়েছেন। ৩.৮ শতাংশ নারী জানিয়েছেন তার গত এক বছরে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন অন্যদিকে ১০.২ শতাংশ নারী জানিয়েছেন গত এক বছরে তারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং থানায় অভিযোগ করেছেন।

শিশু নির্যাতনের কথাও উঠে এসেছে ওই সমীক্ষায়। ১ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের প্রায় ৮৯ শতাংশ সমীক্ষা চলাকালীন আগের এক মাসে অন্তত একবার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ছয় বছর আগে ৮২ দশমিক ৩ শতাংশ শিশু এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হতো। বিবিএসের মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১৯ অনুযায়ী প্রতি ১০ জনে ৯ শিশু নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুদের পিতামাতা ও লালন-পালনকারীদের হাতেই তাঁরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে শিকার হন। শিশুদের শৃঙ্খলাজনিত কারণে মারধর, বকাঝকা, ধমক এসব বিষয় আমলে আনা হয়েছে। (সুত্র: প্রগতির পথে বাংলাদেশ, মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

২০১৯ সালের নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য অনুসারে গত বছর ৫ হাজার ৪০০ নারী এবং ৮১৫টি শিশু ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়। ২০১৮ সালে শিশু ধর্ষণের মামলা ছিল ৭২৭টি এবং নারী ধর্ষণের মামলা ছিল ৩ হাজার ৯০০টি। পুলিশের হিসাব বলছে, গত বছর ধর্ষণের কারণে ১২ শিশু এবং ২৬ জন নারী মারা যান। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ২১ নারী ও ১৪ শিশু। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, সারা দেশে ধর্ষণের ঘটনা আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়েছে। গত বছর সারা দেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার ১ হাজার ৪১৩ নারী ও শিশু। ২০১৮ সালে সংখ্যাটি ছিল ৭৩২। অন্যদিকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বলছে গত বছর ৯০২ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৫৬। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এর তথ্য অনুসারে ২০১৯ সালে প্রতি মাসে গড়ে ৮৪টি শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এ ছাড়া এক বছরে যৌন নির্যাতন বেড়েছে ৭০ শতাংশ। গত বছর যৌন নির্যাতনের শিকার হয় ১ হাজার ৩৮৩ শিশু। ২০১৮ সালের চেয়ে গত বছর শিশু ধর্ষণ ৭৬ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বেড়েছে।

- তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারি ২০২০

লেখা আহ্বান

নাগরিক অধিকার, সুশাসন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখা পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছি। ১০০০-১৫০০ শব্দের মধ্যে বিজয় সুতন্নি ফন্টে লিখে মেইল করুন এই ঠিকানায় nuddyog@gmail.com. লেখার সাথে তথ্য সূত্র থাকা আবশ্যক। ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত কোনও লেখা গ্রহণযোগ্য নয়। "নাগরিক উদ্যোগ ত্রৈমাসিক" নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশেও আগ্রহী।

দক্ষিণ এশিয়ায় এগোলেও সামাগ্রিক বৈশ্বিক লিঙ্গ অসমতা সূচকে পিছিয়ে বাংলাদেশ

গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০-এ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষস্থানে থাকলেও সামাগ্রিক সূচক বিবেচনায় বাংলাদেশ আগের চেয়ে পিছিয়েছে। সামাগ্রিকভাবে লিঙ্গ অসমতা হ্রাসে বাংলাদেশ বিভিন্ন সূচকে গড়ে ৭২.৬% স্কোর পেয়ে ১৫৩ টি দেশের মধ্যে ৫০তম স্থান পেয়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯১তম। নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ, শিক্ষায় অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও আয়ু এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন- এই চারটি প্রধান সূচকের বিপরীতে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে।

গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০ এবং ২০০৬ বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, চারটি প্রধান সূচকের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বাদে প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ ২০০৬ সালের তুলনায় কম স্কোর করেছে। অর্থাৎ, কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি লাভ করলেও সার্বিকভাবে নারী-পুরুষের সমতার চিত্র আগের চেয়ে খারাপ হচ্ছে। এর মধ্যে তিনটি সূচকেই আগের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান বেশ পিছিয়েছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে স্কোর বাড়ার কারণে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

যে চারটি প্রধান সূচককে কেন্দ্র করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় সেগুলোর আবার উপসূচক রয়েছে। চারটি উপসূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের সব দেশের ওপরে স্থান পেয়েছে। সেগুলো হলে ছেলে ও মেয়েশিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, মাধ্যমিকে ছেলে ও মেয়েদের সমতা, জন্মের সময় ছেলে ও মেয়ে শিশুর সংখ্যাগত সমতা ও সরকার প্রধান হিসেবে কত সময় ধরে একজন নারী ক্ষমতায় রয়েছেন।

নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ, শিক্ষায় অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য ও আয়ু এই তিন সূচকেই বাংলাদেশের অবস্থান বেশ পিছিয়েছে। নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ শীর্ষক সূচকে ২০২০ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪১, ২০০৬ সালে ছিল ১০৭। আবার এই সূচকের অধীনে পাঁচটি উপসূচকেই লিঙ্গবৈষম্য বেড়েছে। মজুরির সমতার সূচকে দেশের অবস্থান ৯৮তম। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, পেশাদার ও প্রায়োগিক কর্মীর সূচকে ১৩০ এর পরে দেশের অবস্থান। শিক্ষায় অংশগ্রহণ সূচকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ভর্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার দিক থেকে বাংলাদেশের বিশ্বে শীর্ষে অবস্থান করছে। তবে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান শেষের দিকে। স্বাস্থ্য ও আয়ু-সূচকে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯।

নারী-পুরুষের সমতার দিক থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। তবে পার্লামেন্টে নারীর অংশগ্রহণের উপসূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৬ এবং মন্ত্রীর সংখ্যার হিসাবে ১২৪। সরকার প্রধান পদে দীর্ঘসময় ধরে (গত ৫০ বছরে) নারী থাকার রেকর্ডও বাংলাদেশের। নারীদের রাজনীতিতে আগ্রহ কমে যাচ্ছে কারণ নারীদের রাজনীতিতে আসাই বড় চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার পরেও নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কম এবং মতামতের গুরুত্ব কম দেয়া হয়। তার ওপর নিরাপত্তা ও পরিবেশও বড় বাধা। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে আন্তরিকতারও ঘাটতি রয়েছে।

র‍্যাঙ্কিং দেখে দেশে লিঙ্গবৈষম্য কমেছে ভাববার কারণ নেই, বরং বৈষম্য আরও প্রকট হয়েছে। আরেকটু সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যাবে, দিন দিন নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের পথে চ্যালেঞ্জ বেড়েছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৈষম্য বাড়ছে, স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও নারীরা অনেক বেশি অবহেলিত। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, সংসদে বা দলীয় পর্যায়ে নেতৃত্বে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ এখনো নারীদের ক্ষমতায়নের চিত্র প্রকাশ করছে না।

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক রিপোর্ট

দক্ষিণ এশিয়ার চিত্র ও বৈশ্বিক অবস্থান

দেশ	অবস্থান		স্কোর
	আঞ্চলিক	বৈশ্বিক	
বাংলাদেশ	১	৫০	০.৭২৬
নেপাল	২	১০১	০.৬৮০
শ্রীলংকা	৩	১০২	০.৬৮০
ভারত	৪	১১২	০.৬৬৮
মালদ্বীপ	৫	১২৩	০.৬৪৬
ভুটান	৬	১৩১	০.৬৩৫
পাকিস্তান	৭	১৫১	০.৫৬৪

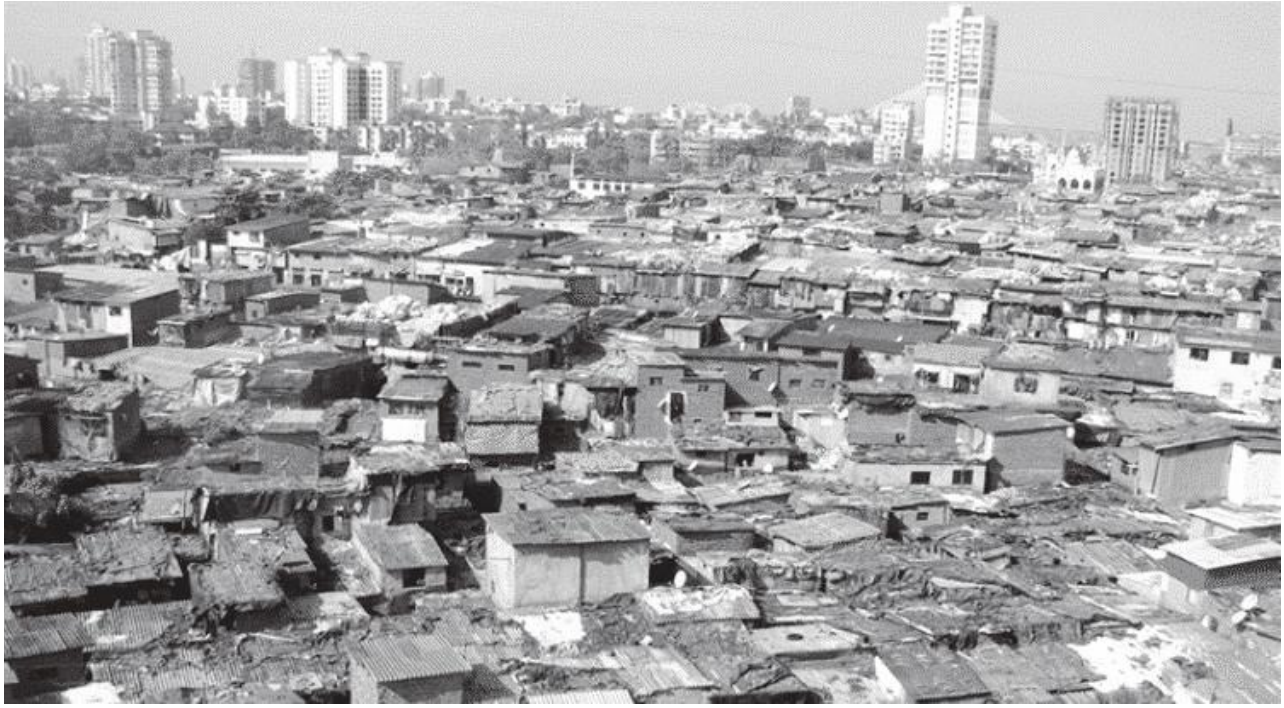

বৈষম্যের সঙ্গে লড়ছে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ

সারা বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এমন দেশে বসবাস করেন, যেখানে বৈষম্য বাড়ছে। বিশ্বের প্রায় ৭১ শতাংশ জনগোষ্ঠী এখন বৈষম্যের সঙ্গে লড়াই করছেন। তবে আয় ও সম্পদ অর্জনে ধনী মানুষেরাই এগিয়ে আছেন। ধনীদের কাছে ক্রমেই সম্পদ ও আয় পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ছে। ১৯৯০ সালের পর থেকে বেশির ভাগ উন্নত দেশ ও কিছু মধ্যম আয়ের দেশে বৈষম্য বাড়ছে। মধ্যম আয়ের দেশের মধ্যে চীন ও ভারত আছে।

জাতিসংঘের সামাজিক প্রতিবেদন ২০২০ এর প্রতিবেদনে বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরে বলা হয়েছে, সামাজিক সূচকে বৈষম্য বেশি এমন দেশে দারিদ্র কমানোর কার্যকারিতা কম।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কয়েক দশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও জীবনমান এর উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি দেশে বৈষম্য বেড়েছে। প্রযুক্তির উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তন, নগরায়ণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন- এই চারটি বিষয়ে বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেমন, প্রযুক্তির উদ্ভাবন অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি বাড়াচ্ছে, কিন্তু মজুরি বৈষম্য তৈরি করছে। বিভিন্ন দেশের নিজস্ব আয়বৈষম্য কমলেও এক দেশের মানুষের আয়ের সঙ্গে অন্য দেশের ব্যাপক ফারাক আছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানুষের আয় সাব-সাহারা অঞ্চলের মানুষের আয়ের ১১ গুন বেশি। আবার সাব-সাহারার মানুষের চেয়ে উত্তর আমেরিকার মানুষের আয় ১৬ গুণ বেশি। জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ১৬টি দেশের নিজেদের সবেচেয়ে গরীব ১০ শতাংশ ও সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের আয়ের তুলনামূলক ছক তুলে ধরা হয়েছে। দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া, ব্রাজিল, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, তুরস্ক, থাইল্যান্ড, ভারত, চীন, বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর ও কঙ্গো। এসব দেশের ভেতরে নিজেদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন আয়বৈষম্য আছে আবার অন্য দেশের সঙ্গ তুলনা করলেও এ বৈষম্য স্পষ্ট। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশের ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, ডেনমার্কের মতো উন্নত দেশের সবচেয়ে গরীব ১০ শতাংশের আয়ের চেয়ে অনেক কম। আর বাংলাদেশের মানুষের গড় আয় ওই তালিকার ১০টি দেশের সবেচেয়ে গরীব মানুষের আয়ের চেয়ে কম। প্রতিবেদনে কোন দেশের মানুষের কত আয় সেটা বলা হয়নি। বাংলাদেশেও বৈষম্য বিরাজমান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যায় জরিপ অনুযায়ী, দেশের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ের চেয়ে ১১৯ গুন বেশি। এখন গিনি সহগ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। এর মানে, বাংলাদেশ এখন উচ্চ বৈষম্যের একটি দেশ।

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক রিপোর্ট

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

নগরে গণশৌচাগার সংকট: স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং করণীয়

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে মোট ১২৯টি ওয়ার্ড-উত্তরে ৫৪টি এবং দক্ষিণে ৭৫টি। ঢাকা মহানগরে প্রায় এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ মানুষের বসবাস। ঢাকা উত্তর-এ ১৯৬.২২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় গণশৌচাগার আছে প্রায় ২৫টি আর দক্ষিণ-এ ১৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনে গণশৌচাগার আছে মাত্র ৩৭টি। নগরের বেশিরভাগ মানুষ কাজের প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় বাহিরে থাকে। প্রায় ৮০% মানুষ পায়ে হেঁটে চলাফেরা করে। এছাড়াও প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষ বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকা আসে কাজের প্রয়োজনে। বাইরে গেলে গণশৌচাগারের সংকটের কারণে নগরবাসীকে বা আগত মানুষকে নানা সমস্যা পোঁহাতে হয়, পড়তে হয় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। দীর্ঘক্ষণ শৌচাগার ব্যবহার না করতে পারার কারনে নানা স্বাস্থ্যগত অসুবিধা হয়। নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। এই নগরে যানজট, ধুলাবালু, শব্দদূষণসহ নানা সমস্যায় ভূগছে নগরবাসী। সেই সাথে অতি প্রয়োজনীয় গণশৌচাগারের মতো বিষয়টি সমভাবে অবহেলিত। ঢাকা নগরের জনসংখ্যা ও আয়তন বিবেচনায় নিলে কয়েকশত গণশৌচাগার প্রয়োজন বলে অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

গণশৌচাগারের বর্তমান চিত্রঃ

৬২টি গণশৌচাগারের উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ৯০% গণশৌচাগার তত্ত্বাবধান করে সিটি করপোরেশন। এর মধ্যে ৫৪% প্রায় বন্ধ থাকে এবং ৯১% নোংরা, অস্বাস্থ্যকর ও ব্যবহার অনুপযোগী। আশার কথা হলো, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন 'নতুন পাবলিক টয়লেট ও বিদ্যমান পাবলিক টয়লেট উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪৫টি আধুনিক গণশৌচাগার নির্মাণ ও ১৭টি পুরানো গণশৌচাগার সংস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি বাস্তবায়ন ও ৮টি সংস্কার করা হয়েছে। উত্তর সিটি করপোরেশন একটি প্রকল্পের আওতায় ৫৩টি গণশৌচাগার নির্মাণ করছে। তবে অগ্রগতি তেমন সন্তোষজনক নয়।

নগরজুড়ে কাচাবাজারগুলোতে কোন গণশৌচাগার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। দু'একটি স্থানে থাকলেও তা ব্যবহার অনুপযোগি। আধুনিক বিপনীবিতানগুলোতে গণশৌচাগার আছে। সিটি করপোরেশনের ওয়েবসাইটে এই এলাকাগুলোর গণশৌচাগারের তথ্য নেই। এগুলোও যথেষ্ঠ পরিমানে পরিচ্ছন্ন নয়। নিউ মার্কেট, গাউছিয়া মার্কেট, চাঁদনী চক, নূর ম্যানশন, চিশতিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত হকার্স মার্কেট-এ গণশৌচাগারগুলো নোংরা, মেঝে পানিতে ভেজা, নগর জুড়ে দু'একটি মার্কেট ছাড়া বেশীর ভাগ মার্কেটগুলোতে গণশৌচাগার ব্যবহার অনুপযোগী।

মতিঝিল কর্মব্যস্ত এলাকা ও ব্যাংক পাড়া হিসাবে পরিচিত অথচ এই এলাকায় কোন স্থায়ী গণশৌচাগার নেই, আছে নামে মাত্র কিছু ভ্রাম্যমান শৌচাগার, গণশৌচাগার না থাকাতে মতিঝিলে আসা কর্মব্যস্ত মানুষের বিপত্তিতে পড়তে হয়। এছাড়া বিপুল পরিমান গাড়ি চালক গাড়ি পার্ক করে বসে থাকেন। অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথে কোন গণশৌচাগার নেই। বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় এখানে স্থায়ী কোন গণশৌচাগার স্থাপনের জন্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে স্থায়ীভাবে গণশৌচাগার বিবেচনায় নেয়া যাচ্ছে না। ওয়াটার এইড

সিটি করপোরেশন-এর সাথে ইতোমধ্যেই কয়েকটি স্থায়ী গণশৌচাগার নির্মাণ করেছেন এবং আরো উদ্যোগ নিতে আগ্রহী, কিন্তু কোন জায়গা পাচ্ছে না। জনসমাগম স্থলে গণশৌচাগারের সংখ্যা কম। যেগুলো আছে সেগুলো প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অপ্রতুল ও অস্বাস্থ্যকর শৌচাগারের ফলে নারীরা UTI (Urinary Tract Infection), Cholera, Diarrhea, Dycentery, Hepatitis-A, Typhoid সহ বিভিন্ন রোগে ভোগে।

ফিলিং স্টেশনগুলোতে গণশৌচাগার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকার কথা বলা থাকলেও নিরাপত্তার ঝুঁকির কথা বলে সর্বসাধারণের ব্যবহারে বাঁধা সৃষ্টি করে। তবে যে কয়টি ফিলিং স্টেশনে সুযোগ রয়েছে তার অধিকাংশই ব্যবহার অনুপযোগি, নোংরা, ও পর্যাপ্ত পানি থাকে না। বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ওনার্স এসোসিয়েশন ও সিএনজি পাম্প এসোসিয়েশনের হিসাবে ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা ১০০টি ও পেট্রোল স্টেশন ১০৮টি।

এসকল ফিলিং স্টেশনগুলোর শৌচাগারগুলোকে সবার জন্য ব্যবহারের (Public Toilet) কথা ভাবছে সরকার। এব্যাপারে ফিলিং স্টেশনের মালিকরা নিরাপত্তার স্বার্থে সর্বসাধারণের জন্য পাম্পের শৌচাগারগুলো ব্যবহার করতে দিতে চান না। সম্প্রতি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচারণায় মেয়র প্রার্থীদের বক্তব্যে পর্যাপ্ত গণশৌচাগার নির্মাণ করবার প্রতিশ্রুতি আছে। এখন দেখবার বিষয় নির্বাচিত মেয়রদ্বয় কতটুকু দায়িত্ব পালন করেন। নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, পর্যাপ্ত গণশৌচাগার তৈরি ও ব্যবস্থাপনায় সিটি করপোরেশন ও রাজউক নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

নগরের যারা কাজের জন্য বাহিরে থাকেন গণশৌচাগার সংকটের কারনে তাদের নানা সমস্যা পোঁহাতে হয়, পড়তে হয় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। দীর্ঘ সময় ধরে শৌচাগার ব্যবহার করতে না পারায় নারী, শিশু, বিশেষতঃ অপ্রাতিষ্ঠানক খাতে কর্মরত শ্রমিকরা বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। উপায় না পেয়ে রিকসাচালকসহ বিভিন্ন অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকরা উন্মুক্ত স্থানে প্রস্রাব করেন। এতে ঢাকা শহরের পরিবেশ দুষিত হচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ এ সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়োনিস্কাশন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

অভিষ্ট ৬-এ সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্য ৬.১ এবং ৬.২-এ ৬ক এবং ৬খ-এ বলা হয়েছে:

৬.১. ২০৩০ সালের মধ্যে, সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যে খাবার পানির প্রাপ্যতা অর্জন

৬.২. নারী ও অল্পবয়সী মেয়েসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন) ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনধারণের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের অবসান ঘটানো

৬.ক. ২০৩০ সালের মধ্যে পানি আহরণ, নির্লবণীকরণ, পানির দক্ষ ব্যবহার, বর্জ্যপানি পরিশোধন, পুনশ্চক্রায়ন (recycling) পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তিসহ পানি ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড ও কর্মসুচিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো

৬.খ. পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সমর্থন ও সহযোগিতা জোরদার করা

অভিষ্ট ১১-এ অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ, প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা। এই অভিষ্ঠ-এর ২টি লক্ষ্যে বলা হয়েছে:

১১.৩. ২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশে অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ন ব্যবস্থার প্রসার এবং অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১১.৬. বায়ুর বিশুদ্ধতার মান এবং পৌর ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবেশের ওপর নগরসমূহের মাথাপিছু বিরুপ প্রভাব কমিয়ে আনা।

এপ্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ অর্জনে নগরবাসীর পর্যাপ্ত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জরুরী যা করণীয় তা হলো-১. প্রতিটি ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত গণশৌচাগার নির্মাণ করা; ২. যেখানে গণশৌচাগার রয়েছে এর চারপাশে দৃশ্যমান নির্দেশনা দিয়ে পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা আলাদা গণশৌচাগার নির্মাণ করা ও ব্যবহার উপযোগী করা; ৩. গণশৌচাগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয়ভাবে কমিটি গঠন করা এবং সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োগ; ৪. গণশৌচাগার ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ ৫/- টাকা নির্ধারণ করা; ৫. গণশৌচাগারের জন্য পানি ও বিদ্যুৎ বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করা; ৬. গণশৌচাগার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য আলাদা মনিটরিং দল গঠন করা; ৭. লঞ্চ টার্মিনাল, বাস টার্মিনাল, ট্রেন স্টেশনসহ জনসমাগমস্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ গণশৌচাগারের ব্যবস্থা করা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; ৮. প্রতিটি বাজার/মার্কেটে পর্যাপ্ত গণশৌচাগারের ব্যবস্থা করা এবং তা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া; ৯. ঢাকা শহরের অনেক জায়গায় গণশৌচাগার থাকা সত্বেও দেখা যায় সেগুলো বন্ধ থাকে, এইসব গণশৌচাগারগুলো নিয়মিত খোলা রাখার উদ্যোগ নেয়া; ১০. ব্যবহারকারীদের গণশৌচাগার ব্যহারের নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতন করা।

- নিবন্ধটি ২ মার্চ, ২০২০ গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে জনগণের স্বাস্থ্য আন্দোলন (পিএইচএম)-বাংলাদেশ আয়োজিত 'নগরে গণশৌচাগার সংকট: স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং করণীয়' শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপিত।

বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের শীর্ষ অবস্থান করছে ঢাকা

বাতাসের শহরের তালিকায় ঢাকা বারবার শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার এর জানুয়ারী-মার্চ ২০২০ প্রকাশিত ইনডেক্সে- ঢাকার এই তথ্য উঠে এসছে। ২৫ জানুয়ারি শনিবার সকাল ৮টা ১৯ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) ঢাকার স্কোর ছিল ২৪৭ যার মাধ্যমে বিশ্বে দুষিত বাতাসের শহর হিসেবে ঢাকার অবস্থান ছিল চতুর্থ। যার অর্থ এ শহরের বাতাসের মান 'খুবই অস্বাস্থ্যকর'। বসনিয়া হার্জেগোভিনার সারায়েভো, মঙ্গোলিয়ার উলানবাটোর এবং চীনের জিনজিয়াং যথাক্রমে ৪১১, ২৬৬ ও ২৫৫ স্কোর নিয়ে এ তালিকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল। একিউআই স্কোর ৩০১ থেকে ৫০০ বা তারও বেশি হলে বাতাসের মান ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়। একিউআই সূচকে ৫০ এর নিচে স্কোর থাকার অর্থ হলো বাতাসের মান ভালো। সূচকে ৫১ থেকে ১০০ স্কোরের মধ্যে থাকলে বাতাসের মান গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, একটি নির্দিষ্ট শহরের প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে একিউআই সূচক তৈরি করা হয়। যার মাধ্যমে একটি শহরের বাতাস কতটুকু বিশুদ্ধ বা দূষিত এবং সেই সঙ্গে ওই পরিস্থিতিতে কোন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে সেই তথ্য দেওয়া হয়।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঢাকার অবস্থান ছিল বিশ্বে দুষিত বায়ুর শহরের মধ্যে শীর্ষে। সকাল ৮টা ৪৪ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) ঢাকার স্কোর ছিল ২৫৮। ভারতের দিল্লি ও পাকিস্তানের লাহোর যথাক্রমে ২৫৭ ও ২৫৫ একিউআই স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা ৫ মিনিটে একিউআই ইনডেক্সে ১৯৭ স্কোর নিয়ে ঢাকার অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ সকালে দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল ঢাকা। এদিন সকাল ৮টা ২৭ মিনিটে একিউআই ইনডেক্সে ঢাকার স্কোর ছিল ২৩০। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় টানা তিনদিন সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে (শীর্ষে) ছিল ঢাকা।

অন্যদিকে এয়ার ভিজ্যুয়ালের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বিশ্বের শীর্ষ দূষিত বায়ুর শহরের তালিকা থেকে এতদিন ধরে যে দেশগুলো যেমন চীন ও ভারতের শহরগুলো সবসময় শীর্ষে থাকতো সেই শহরগুলোর উন্নতি হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বজুড়ে রাস্তাঘাট ও কলকারখানায় মানুষের ব্যস্ততা কমে যাওয়ায় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের বায়ুদূষণ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম কার্বন নিঃসরণকারী দেশ চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বায়ুর মানে ব্যতিক্রমী উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু ঢাকার বায়ুর মানে বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এয়ার ভিজ্যুয়ালের পর্যবেক্ষণে মার্চ মাসে দুষিত বায়ুর শহরগুলোর মধ্যে ঢাকার পরেই ছিল যথাক্রমে ভারতের দিল্লি, থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই, নেপালের কাঠমান্ডু ও সার্বিয়ার বেলগ্রেড। গত এক মাসের মধ্যে দূষিত বায়ুর শহরের শীর্ষ ১০-এর তালিকায় ৯ নম্বরে শুধু চীনের চেংদু শহরের নাম রয়েছে। ইতালি, স্পেন, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো শহরের নাম দূষিত শহরের শীর্ষ ২০-এর তালিকাতেও নেই।

ঢাকার স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (সেন্টার ফর এটোমেস্ফোরিক পল্যুশন স্টাডিজ-ক্যাপস) এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকার গাছপালায় প্রতিদিন ৪৩৬ মেট্রিক টন ধূলিকণা জমে থাকে, মাসে এই ধুলার পরিমান ১৩ হাজার মেট্রিক টন। জমে থাকা ধুলা দিনের বেলা বাতাসে মিশে যেমন দূষণ বাড়ায় আবার রাতে গাড়ির অতিরিক্ত গতির সঙ্গে বাতাস ওড়ে। ফলে দিনের বেলা থেকে রাতের বেলা বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। গবেষণায় আরো উঠে এসেছে যে, ঢাকা শহরের বাতাসে দূষিত বস্তুকণার পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে প্রায় ৫ গুণ বেশি। ক্যাপস-এর গবেষণায় ঢাকার বাতাসে অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণা পিএম-২.৫-এর পরিমাণ বেশি পাওয়া গেছে যা সাধারণ জীবাশ্ম পোড়ানো জ্বালানি থেকে আসে। অর্থাৎ যানবাহন, শিল্পকারখানা থেকে ও জৈব বস্ত পোড়ালে যে ধোঁয়া বের হয়, তা থেকে আসে। অথচ এতদিন ঢাকা শহরের বায়ু দুষণের উৎস হিসেবে ইটভাটাকে দায়ী করা হতো। সাধারণত নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ইটভাটাগুলো চালু থাকে। কিন্তু ঢাকার বায়ু বছরে ৩০০ দিন খারাপ বা অস্বাস্থ্যকর থেকে খুবই অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকছে। এতে বাঝা যাচ্ছে, যানবাহনের

ধোঁয়াসহ অন্য উৎসগুলোও দূষণে অনেক বেশি ভূমিকা রাখছে।

ম্যাগাজিন ফর এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজার নামের একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকীতে গত ২৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত একটি গবেষণা নিবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, দেশের ভেতরে নয়, বাইরে থেকেও দূষিত বাতাস বাংলাদেশে আসছে। এর ফলে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরের বায়ুর মান আরও খারাপ হচ্ছে। ভূ-উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি ও মানচিত্র এবং মাঠপর্যায় থেকে সংগ্রহ করা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে ভারতের ইন্দোগাঙ্গেয় অববাহিকা এলাকায় ফসল কাটার পর খড় পুড়িয়ে ফেলার ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া দিল্লি শহরকে দূষণের পাশাপশি তা হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশেও প্রবেশ করছে। ভারত, নেপাল, মঙ্গোলিয়া ও পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে শীত থেকে রক্ষার জন্য মানুষ বাড়িতে কাঠ, তুষ ও খড় পোড়ায়। রান্নাসহ অন্যান্য কাজেও গ্রামের মানুষ জৈব জ্বালানি ব্যবহার করে। এতে সৃষ্ট দূষিত বায়ুর প্রবাহ নভেম্বরে বাংলাদেশে প্রবেশ করে, যা বাংলাদেশের বায়ুকে আরও দূষিত করে তোলে।

বাংলাদেশ সরকারের পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, যুক্তরাষ্ট্রের ক্লার্কসন বিশ্ববিদ্যালয় ও রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা গত দুই দশকে ঢাকার বাতাসের মানের ওপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব নিয়ে আরেকটি গবেষণা করেছেন। গবেষণায় বাংলাদেশে বায়ুদূষনের অন্যতম কারণ হিসেবে আন্তসীমান্ত বায়ুপ্রবাহের কথা উল্লেখ করা হয়। আফগানিস্তান, ইরান ও মঙ্গোলিয়ার শুষ্ক মরু অঞ্চল থেকে ধূলিকণা বাতাসে মিশে যায় এবং পশ্চিমা লঘুচাপের মাধ্যমে ওই ধূলিকণাসহ বায়ু ভারতে প্রবেশ করে। নভেম্বর থেকে ওই দূষিত বায়ু বাংলাদেশে প্রবেশ করে। গবেষণায় ভারতের কলকাতা, মুম্বাই, পাকিস্তনের করাচি ও বাংলাদেশের ঢাকায় অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে মারাত্মক যানজট ও ধোঁয়া তৈরির বিষয়টি উঠে আসে। সামগ্রিকভাবে ওই শহরগুলো এই অঞ্চলের বায়ুকে দূষিত করে ফেলছে। অন্যদিকে ভারত ও চীনের উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ আসে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আসা ধোঁয়া বাংলাদেশের বায়ুদূষণের আরেকটি কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশও কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির দিকে আগাচ্ছে। একই সাথে নতুন নতুন বড় অবকাঠামো নির্মাণ বেড়ে গেছে, যা বায়ুকে আরও দূষিত করছে। যদিও বায়ু দূষণ রোধে সরকার আইন তৈরির পাশাপাশি অনেক উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু আসীমান্ত বায়ুদূষণ বন্ধ করা সরকারের অনেকটা আয়ত্ত্বের বাইরে। আঞ্চলিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বায়ুদূষণ রোধে সমন্বিত উদ্যোগ বায়ু দূষণ কমাতে সম্ভব।

দূষণের নগরী হিসেবে ঢাকাকে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন ঘোষণা করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট

গত ২২ জানুয়ারি ২০২০ বুড়িগঙ্গা দূষণ সংক্রান্ত এক মামলার শুনানিকালে বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ও মোহাম্মদ উল্লাহ'র হাইকোর্ট বেঞ্চ ঢাকাকে প্রতিবেশ সংকটাপন্ন ঘোষণা করা উচিত বলে মন্তব্য করেন। শুনানী চলাকালীন বিচারপতিগণ ঢাকার বায়ু দূষণের হার দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে ঢাকাকে বিশ্বের এক নম্বর দূষিত শহর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যদি এই রকম দুরাবস্থা হয়, সেক্ষেত্রে ইকোলোজিক্যাল ক্রিটিকাল এরিয়া ঘোষণা করার বিধান আছে পরিবেশ আইনে। এখন যেহেতু ঢাকা সবচেয়ে দূষিত নগরী, তাই গোটা ঢাকা শহরটাকেই ইকোলোজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া ঘোষণার সময় এসেছে। গত ২০ জানুয়ারি হাইকোর্ট বুড়িগঙ্গা নদী দূষণে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ও বর্জ্য সংশোধনাগার ছাড়া চলা ২৩১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে বন্ধ করতে পরিবেশ অধিদফতরকে নির্দেশ দেয়। সেইসঙ্গে এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদফতরের চিঠি পাবার পর ওইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ঢাকা ওয়াসা, তিতাস গ্যাস ও ডিপিডিসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালতের নির্দেশনা কার্যকর করতে সহযোগিতা দিতে ঢাকা জেলা প্রশাসক, ডিএমপি কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট থানার ওসিকে নির্দেশ দেয় আদালত। এই আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের পরিবেশ অধিদফতরের মাধ্যমে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে।

গবেষণায় দেখানো হয়েছে ভারতের ইন্দোগাঙ্গেয় অববাহিকা এলাকায় ফসল কাটার পর খড় পুড়িয়ে ফেলার ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া দিল্লি শহরকে দূষণের পাশাপশি তা হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশেও প্রবেশ করছে।

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক রিপোর্ট

আইন ও আদালত

আইনের শাসন সূচকে বিশ্বের ১২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫ তম

আইনের শাসন সূচকে গত এক বছরে বাংলাদেশের কয়েক ধাপ অবনতি হয়েছে। ২০২০ সালে বিশ্বের ১২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫তম। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট (ডব্লিউজেপি) প্রতি বছর ৮টি সূচকের বিপরীতে আইনের শাসন সূচক প্রকাশ করে থাকে। ডব্লিউজেপি প্রকাশিত আইনের শাসন সূচকে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২৬টি দেশের মধ্যে ১১২তম, ২০১৮ সালের প্রকাশিত সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১০২ তম। দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। অবশ্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এ বছর একই রয়েছে। এ বৎসর নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারত বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে গেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে গেছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। নিম্নমধ্যম আয়ের ৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২১তম। যে ৮টি সূচকের প্রেক্ষিতে এই মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো- ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতির অনুপস্থিতি, উন্মুক্ত সরকার, মৌলিক অধিকার, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতার প্রয়োগ, নাগরিক ন্যায়বিচার এবং ফৌজদারি বিচার কাযক্রম।

আইনের শাসনের ক্ষেত্রে একমাত্র শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সূচকে বাংলাদেশের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অন্য সূচকগুলোর মধ্যে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতির অনুপস্থিতি, উন্মুক্ত সরকার, মৌলিক অধিকার, নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতার প্রয়োগ, নাগরিক ন্যায়বিচার এবং ফৌজদারি বিচারে বাংলাদেশের অবস্থার অবনতি হয়েছে। মৌলিক অধিকারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে নিম্নগামী এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৮টি দেশের মধ্যে ১২২তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে, অর্থাৎ ছয়টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। আর মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে বাংলাদেশের পরে রয়েছে তুরস্ক, ভেনেজুয়েলা, মোজাম্বিক, চীন, মিসর ও ইরান। ডব্লিউজেপি'র আইনের শাসন সূচকে যে তিনটি দেশ সবচেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে সেগুলো হলো ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং নরওয়ে। আর সবচেয়ে নীচে রয়েছে ভেনেজুয়েলা, কম্বোডিয়া ও কঙ্গো। ১২৮টি দেশের ১ লাখ ৩০ হাজার খানায় জরিপ ও চার হাজার আইনজীবীর মতামত নিয়ে ডব্লিউজেপি এই সূচক ও প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে শিশুদের বিচার ও দন্ড আইনসম্মত নয়

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে শিশুদের আর বিচার ও দন্ড প্রদান করা যাবেনা। গত ১১ মার্চ ২০২০ বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মো. মাহমুদ হাসান তালুকদারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক শিশুদের বিচার ও দন্ড প্রদানকে আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করে আদেশ দেয়। ১৯ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে হাইকোর্ট স্বতপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ২০১৯ সালের ৩ মে থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত র‍্যাবের ভ্রাম্যমান আদলত ১২১ টি শিশুকে সাজা প্রদান করে যারা টঙ্গীর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে অন্তরীণ ছিল। আদালত রুলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১২১ শিশু বা অন্য শিশুদের আটক, বিচার ও দন্ডাদেশ কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চান। রুলের শুনানি শেষে সাম্প্রতিক ভ্রাম্যমাণ আদালতে দন্ডিত ১২১ শিশুর সাজা বাতিল করে এ রায় দেয়া হয়। এছাড়া এই শিশুদের মধ্যে কেউ অন্য কোন অপরাধে জড়িত না থাকলে অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিতে বলা হয়। আদালত রায়ে পর্যবেক্ষণ দেন যে, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট একই সঙ্গে প্রসিকিউটর ও বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন, যা আইনের শাসনকে আঘাত করে। এছাড়াও সংবিধানের তৃতীয় ভাগে থাকা অনুচ্ছেদগুলো অন্যান্য নাগরিকের মতো শিশুদের মৌলিক অধিকারও নিশ্চিত করেছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজা দেয়া শিশুদের মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। এছাড়াও আদালত বলেন যে, শিশুর বিরুদ্ধে যেকোনো অভিযোগের বিচার শুধু শিশু আদালতে হতে হবে। আদালত আরো বলেন, শিশু আইনের মতো একটি বিশেষ আইন থাকারও পরও ভ্রাম্যমাণ আদালত কোনো শিশুর বিচার করতে পারেন না। ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনেও শিশুদের বিচার করা যাবে না, বিচার হলে তা আইনের দৃষ্টিতে শুরু থেকেই অবৈধ বলে আদালত রায়ে উল্লেখ করেন।

প্রাথমিক সমাপনী পরিক্ষায় শিশুদের বহিস্কার নয়

প্রাথমিক (পিইসি) ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শিশুদের আর বহিস্কার করা যাবে না- এমন রায় দিয়েছে উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশনায় শিশুশিক্ষার্থীদের বহিষ্কার সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিধানটি বাতিল করা হয়েছে। বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট এর একটি বেঞ্চে গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ এ তথ্য জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। শুনানি শেষে আদালত এ সংক্রান্ত রুল নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, গত ১৯ নভেম্বর ২০১৯ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় 'পিইসি পরীক্ষায় শিশু বহিষ্কার কেন' এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ২১ নভেম্বর ২০১৯ আদালত স্বত-প্রণোদিত হয়ে একটি রুল জারী করে। রুলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জারি করা নির্দেশনার ১১ নম্বর দফা (কেন্দ্রে শৃঙ্খলা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা) কেন অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করা হবে না। তা জানতে চাওয়া হয় জেএসসির ব্যপারেও কি একই নিয়ম আছে কি না? সে বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়। এছাড়াও রুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শিশু পরীক্ষার্থীদের বহিষ্কার করা কেন অবৈধ হবে না এবং বহিষ্কার হওয়া শিশু পরীক্ষার্থীদের পুনরায় পরীক্ষা নিতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। আদালত প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথ মিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে দুই সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে আদেশ দেয়। উল্লেখ্য যে, অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে ২০১৯ সালে পিইসিতে ৮২ শিক্ষার্থী এবং ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১৫৮ শিক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। এ হিসেবে মোট বহিষ্কৃত হয় ২৪০ শিশু শিক্ষার্থী। গত ১৮ ডিসেম্বর রুলের জবাব দেয়ার দিন ধার্য হলেও অধিদপ্তর কোন জবাব না দেয়ায় আদালত আদালত ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বহিষ্কার হওয়া শিশুশিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিতে এবং ৩১ ডিসেম্বরের মধ্য ফল প্রকাশ করতে বলে। ১৫ জানুয়ারী ২০২০ রাষ্ট্রপক্ষ আদালতকে জানায় হাইকোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ নতুন পরীক্ষাসূচি অনুযায়ী অনুসারে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হয়।

- নাগরিক উদ্যোগ ডেস্ক রিপোর্ট

দলিত নারী ও টেকসই উন্নয়ন

জন্ম ও পেশাগত কারণে বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার শিকার জনগোষ্ঠী দলিত হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও দলিত ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সারা বিশ্বের ২৬ কোটি দলিত জনগোষ্ঠীর ২১ কোটি বা ৮০ শতাংশই দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে। দক্ষিণ এশিয়ার দলিতরা বিশেষ করে নারীরা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার, নিগৃহীত এবং মানবেতর জীবনযাপন করছে। দলিত নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেন নিয়মে পরিনত হয়েছে। সারা পৃথিবীতেই পুরুষের চেয়ে নারীরা কম অধিকার ভোগ করে আসছে আর এশিয়াতে নারীদের অবস্থান আরো নাজুক। দলিত নারীরা তাদের এই অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংগ্রাম তাদের মর্যাদার-ন্যায্যতার।

বাংলাদেশের দলিত নারীদের অবস্থা:

নারী স্বাধীনতা:

দলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হোন দলিত নারীরা, প্রথমত: দলিত হিসেবে বৃহৎ মূলধারার সমাজে, দ্বিতীয়ত নিজ সমাজে নারী হিসেবে। পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল। এই জনগোষ্ঠীর নিজ সামাজিক রীতিনীতির কারণে নারীদের জন্য সমাজের বাইরে বের হওয়া দূস্কর। যদিও শহরাঞ্চলে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, কিন্তু তা কেবল পেশাগত কারণে। নারী হিসেবে লেখাপড়া বা অন্য কোনো কারণে বাইরে বের হওয়া তাদের পক্ষে মুশকিল। বাল্যবিবাহ এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথা হয়ে দাড়িয়েছে, এর সাথে অনেক নারী প্রতিনিয়ত যৌতুকের কারণে নিপীড়ণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কোনো কারণে দলিত নারীরা স্বামী পরিত্যক্ত হলে বা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সমাজে টিকে থাকা তাদের জন্য আরো কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া রয়েছে নারী হিসেবে তার সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। একজন মানুষ যখন প্রতিনিয়ত নিপীড়ণের শিকার হয় আবার একই সাথে শিক্ষার আলো থেকে দূরে থাকে তখন তার সহজাত প্রতিবাদ করার সক্ষমতা আর থাকেনা। এই দেশ ও সমাজে দলিত নারীর বাস্তব রূপও এই রকম যার ফলে দলিত নারীর জীবন পরাধীনতায় প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে আছে।

শিক্ষা সুযোগ:

প্রবল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে দলিত জনগোষ্ঠির মেয়েদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ আরও কম। শহরাঞ্চলে দলিত সমাজের মেয়েরা এখন কিছু পরিমাণে কলেজে যাওয়া শুরু করলেও গ্রামে বসবাসকারীরা বাল্যবিবাহের কষাঘাতে জর্জরিত যা তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। নাগরিক উদ্যোগ পরিচালিত 'বাংলাদেশের দলিত সমাজ: বৈষম্য, বঞ্চণা ও অস্পৃশ্যতা' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে, দলিত শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৭২ শতাংশ, যেখানে জাতীয় পর্যায়ে তা প্রায় শতভাগ। আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া দলিত শিশুদের ৬৩ ভাগই বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ছে। আর ঝড়ে পড়ার হারও মেয়ে শিশুদের মধ্যে বেশি। মাধ্যমিক পর্যায়ে দলিত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের হার ১২.৫ শতাংশ, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪.৩ শতাংশ আর উচ্চ শিক্ষায় মাত্র ১.৯ শতাংশ। এর পাশাপাশি দলিত শিশুদের যারা স্কুলে পড়ছে, তারা কখনো শিক্ষক, আবার সহপাঠীদের দ্বারা এমন সব আচরণ ও বৈষম্যের শিকার হয়, যা তাদের স্কুলে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। শহরাঞ্চলের দলিত শিশুরা বিশেষ করে যারা ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছে সেইসব শিশুদের জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে এসব অবাঙালী দলিত শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তর পার হতে পারে না। এ অবস্থা দলিত মেয়েশিশুদের ভিন্ন নয়।

পানি ও পয়: নিষ্কাষণ:

শহরাঞ্চলে দলিত কলোনীগুলোতে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নেই। দলিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই রাস্তার পার্শ্বে বা বস্তিতে বসবাস করে, সেসব স্থানে বা বসবাসের জায়গায় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। আর এই পানি সমস্যায় সবচেয়ে ভূক্তভোগী হলো নারীরা কেননা পরিবারের প্রতিদিনের রান্না, বাসন মাজা, কাপড় ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পানি পরিবারের নারীকেই যোগাড় করতে হয়। অধিকাংশ দলিত কলোনীগুলোতে নারীদের গোসলের আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। খোলা জায়গায় নারী ও পুরুষ একসাথে গোসল করতে বাধ্য হয়। গাবতলী সিটি সুইপার কলোনী, ওয়ারি, গণকটুলি, নাজিরাবাজার, পঙ্গু সুইপার কলোনীসহ ঢাকার প্রায় ১৭ টি কলোনীর অবস্থা আলাদা কিছু নয়। এছাড়া, নগরাঞ্চলের বাইরে চা-বাগানসহ গ্রামীণ দলিত কলোনীগুলোর অবস্থা এর চেয়ে বরং আরও খারাপ।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র:

দলিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, তাদের বাসস্থান ও পয়:নিষ্কাশণ সুবিধার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেহেতু দলিত জনগোষ্ঠী নোংরা পরিবেশে বাস করে এবং চরম দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী, ফলে তারা সারাবছরই নানারকম রোগ, যেমন- জ্বর, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেটের পীড়া ও ত্বকের অসুখসহ বিভিন্ন অসুখে

ভূগে থাকে। দরিদ্রতার ফলে তারা পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা নিতে পারে না। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে গেলেও অস্পৃশ্যতার কারণে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দলিতদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। দলিত নারীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি আরো দূরহ বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের অসুখ-বিসুখকে গুরুত্ব দেয়া হয় না, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য ক্লিনিকে নেয়া হয় না। অনেক সময় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার এবং নার্সরা চিকিৎসার প্রয়োজনেও শরীর স্পর্শ করে না, হাসপাতালে বিছানা না দিয়ে মেঝেতে থাকতে দেয়।

পেশা ও কর্মসংস্থান:

বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠীর পুরুষেরা পেশার প্রয়োজনে এলাকা ত্যাগ করতে পারলেও নারীদের জন্য তা প্রায় অসম্ভব। প্রথমত, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তারা নারী বলে কোথাও একা থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। দ্বিতীয়ত: উচ্চশিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করে দক্ষ হওয়ার সুযোগ দলিত নারীদের একেবারেই নেই বললেই চলে। আবার অর্থনৈতিক দুর্দশা দলিত নারীকে ঘরে বসে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে রাখে। ফলে সিডও সনদে উল্লেখিত পেশা বেছে নেয়ার সুযোগের অধিকারটি বাংলাদেশে দলিত নারীদের জন্য প্রযোজ্য নয় বললেই চলে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পাশাপাশি দলিত নারীরা বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র তৈরি, ঘরে বসে মোমবাতি, আগরবাতি ও ঠোঙ্গা বানানো ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করে।

সরকারি সেবাপ্রাপ্তি:

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদান করে আসলেও এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই এই সেবার বাইরে থেকে গেছে। এই নীতিমালার আওতায় দলিত জনগোষ্ঠীর ৫ বছরের উর্ধ্বে শিশুদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ১৮ বছরের উর্ধ্বে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান, মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা প্রাপ্তিতে দলিত জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, সমাজসেবা অধিদফতরের অধীন অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উল্লেখিত সেবাসমূহ প্রদানের বিধান থাকলেও দলিত জনগোষ্ঠীর খুব কম সংখ্যক মানুষ এই সেবা পেয়ে থাকেন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর আলোকে বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান:

বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সফলতার সাথে অর্জন করেছে এবং সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনেও বদ্ধপরিকর।

এসডিজির মূল অঙ্গীকার-"কাউকে পিছনে রাখা যাবে না"- এপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের প্রায় ৬৫ লাখ দলিত জনগোষ্ঠীকে পিছনে রেখে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কোনভাবে সম্ভব নয়। এসডিজির অভীষ্ঠগুলোতে পৌঁছাতে হলে যেমন প্রয়োজন বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকারবোধ, তেমনি জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীকার ও কর্তব্যপরায়নতা। এই দুই অবস্থান থেকে এসডিজি'র বাস্তবায়ন দেখতে হবে।

বৈষম্য ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে দলিত নারীদের ইতিবাচক কোন দৃশ্যমান পরিবর্তন হয়নি। আবহমানকাল থেকে এই জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তারা বৈষম্যের শিকার অথচ সমাজের কতিপয় অপরিহার্য পেশার সাথে সম্পৃক্ত। ২০১৩ সালে সরকার প্রণীত 'দলিত হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালায় স্বীকার করা হয়েছে- "দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সকল নাগরিক সুবিধাভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও দলিত জনগোষ্ঠী যারা বংশ পরম্পরায় জাত-পাত ও অস্পৃশ্যতার শিকার হয়ে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। জন্ম, জাতপাত ও পেশাগত কারণে বৈষ্যমের শিকার এই অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি তাই গুরুত্বসহকারে টেকসই উন্নয়নের আলোকে বিবেচনা করতে হবে। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া সমাজ, রাষ্ট্র ও সকলের দায়িত্ব।"

বাংলাদেশে দলিতদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্রসমূহকে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রার নিরিখে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সর্বক্ষেত্রেই দলিতদের অবস্থা দুর্বল (নাজুক)। বিশেষত অভীষ্ট- ১. দারিদ্র বিমোচন, ৩. সুস্বাস্থ্য, ৪. মানসম্মত শিক্ষা, ৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি, ১০. বৈষম্য হ্রাস, ১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার, ১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব- দলিতদের উন্নয়নের সম্পর্ক একেবারেই অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশের দলিতরা যে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রায় অগ্রাধিকারভিত্তিক উপকারভোগী হওয়ার দাবিদার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৭টি লক্ষ্যের প্রায় সব ক'টিতেই দলিতদের বিষয়টি বিবেচনায় রাখার মতো।

দলিত নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নে করণীয়:

বিদ্যমান বাস্তবতা থেকে দলিত নারীদের বের করে এনে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে সরকারের পাশাপাশি সকলকেই সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং আস্থা অর্জনের জন্য এখন থেকে করণীয়, তাহলো-

- দলিত ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য 'বৈষম্য বিলোপ আইন' প্রণয়ন করতে হবে।
- কোন দলিত মেয়েশিশু যেন শিক্ষাজীবন থেকে ঝড়ে না পড়ে, রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে, এক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারে;
- উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে দলিত নারীরা যেন মূলধারার পেশায় সম্পৃক্ত হতে পারে সরকারকে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- দলিত মেয়েশিশু যেন বাল্য বিবাহের শিকার না হয় রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে; এক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নিজ নিজ কর্ম এলাকায় মনিটরিং-এর দায়িত্ব নিতে পারে;
- পেশাজীবী দলিত নারীরা মাতৃত্বকালীন সময়ে যেন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সকল সুবিধা পূর্নাঙ্গরূপে ভোগ করতে পারে রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে;
- দলিত নারীরা যাতে অন্য পেশায় যেতে পারে সেজন্য সরকারি, বেসরকারিভাবে দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- দলিত কলোনীগুলোতে নারীদের জন্য আলাদাভাবে টয়লেট ও গোসলখানা স্থাপন।

- তামান্না সিং বাড়াইক
কর্মসূচী কর্মকর্তা, দলিত নারী ফোরাম

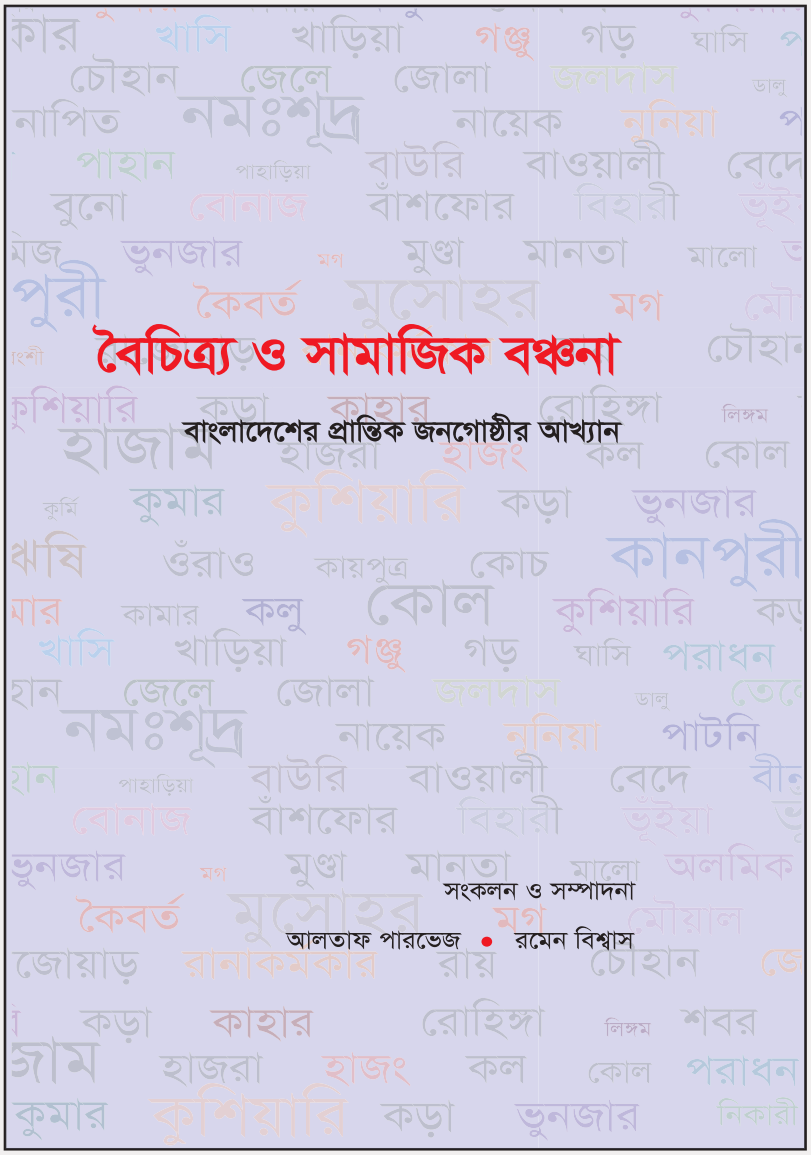

বইয়ের নাম: **বৈচিত্র্য ও সামাজিক বঞ্চনা: বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আখ্যান।**
সংকলন ও সম্পাদনা: আলতাফ পারভেজ ও রমেন বিশ্বাস।
প্রকাশকাল: জুন, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
মূল্য: ২০০ টাকা।